

শ্রীশ্রীমৎ কর্তা মহারাজ

শ্রীশ্রীমৎ কর্তা মহারাজ

তৃতীয় সংস্করণ
আনন্দাদ-১৮৬
১৪২৪ বাংলা

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার
মূল্য : ৮০.০০ (আশি টাকা)

সর্ব ধর্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

শ্রীশ্রীমৎ কর্তা মহারাজ

প্রকাশনায়

শ্রী সন্তোষ চন্দ্র পাল

সেক্রেটারী

সর্ব ধর্ম মিশন, ভোলাচং, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
[সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

যে ভক্তদ্বয়ের দানের অর্থে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ
মুদ্রিত হইয়াছে :

১) পিতৃদেব ডাঃ কালাচাঁন ও মাতৃদেবী সুমিলা রাণী ধরের
পুণ্য স্মৃতির স্মরণে-

পুত্র : শ্রী স্বপন চন্দ্র ধর

পুত্রবধু : শ্রীমতি রীতা রাণী ধর

গ্রাম-দেবীদ্বার, ডাকঘর-দেবীদ্বার, জেলা- কুমিল্লা।

২) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভক্ত।

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায়

শ্রী সন্তোষ কুমার পাল

প্রেসিডেন্ট

সর্ব ধর্ম মিশন

ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

মুদ্রণেঃ আনন্দ গ্রাফিক্স,
চিটাগাংরোড, নারায়ণগঞ্জ।

নিবেদন

যে মহা মানবের মহান জীবন চরিত লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি তিনি একজন জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ। সর্ব ধর্মের প্রবর্তক স্বামিজী মহারাজ বলিয়াছেন জগতের সকল ধর্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং জাতিগত পার্থক্য দূর করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই এক বিশেষ ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে-তাহার কথা জগত শুনিবে। এক উপাসনায় দয়াময় বলিয়াছেন “একজন ত্রিদিব বিজয়ী পুরুষের কার্য্য আসিল। ইনি ইহলোক ও যেমন পরলোক ও তেমন প্রত্যেকের সাধন পূর্ণ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া সকলের উপায় করিল।” কে সেই বিশেষ ব্যক্তি ইহার সমাধান ও তিনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি ধর্ম চক্রের প্রবর্তন করিবেন তিনিই সেই বিশেষ ব্যক্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন সর্ব ধর্ম মিশনের ভার যাহার উপর অর্পিত হইয়াছে তিনিই সেই বিশেষ ব্যক্তি। এই বিশেষ ব্যক্তির কর্তৃত্ব সকলেই স্বীকার করিবে। দয়াময়ের ষোল আনা বিশ্বাসের কার্য্য এই বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আছে। সুতরাং এই বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় পরিষ্কার ভাবেই এখন জগতে প্রকাশিত হইল।

শ্রী আনন্দের আদেশ পাইয়াই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মিশন প্রতিষ্ঠার পর তিনি

আজীবন মিশনের উন্নতির জন্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব ধর্মের যাবতীয় কাজ এখন মিশনের ভিতর দিয়াই জগতে প্রচারিত হইতেছে। মিশন প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন শ্রী আনন্দের ধর্মের যাবতীয় কার্য্য এখন মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন পৃথিবীতে এমন দিন আসিতেছে যে দিনে জগতের একটি লোকও মিশনের মধ্যে না আসিয়া মিশনের বাহিরে থাকিতে পারিবে না। তিনি আরও বলিতেন পূর্ণ কার্য্য আরদ্ধ হইলে দেহধারী মানব ও দেবতা সকল পার্থক্য ভুলিয়া পরলোক হইতে প্রকাশিত হইবে। সকলেই দয়াময় নামের জয় ঘোষণা করিবে। সে দিনে আমাদের দুর্দিন ঘুচিবে। তাহার আরও উক্তি আছে ইহ পরলোক দয়াময় নামই জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ- এই বার্তা চিরকাল মিশন প্রচার করিবে। যুগে যুগে দেখা যায় ধর্ম সংস্থাপনার্থে এবং অধর্ম বিনাশের জন্য সময় সময় ধর্ম প্রবর্তক জগতে আবির্ভূত হইয়া নব নব ভাবে ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে তাদের বিশ্বাসী সন্তানগণ আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব ধর্মের প্রচার করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। আমরাও দেখিতেছি শ্রী আনন্দের ধর্মময় জগতে প্রচার করিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সর্ব ধর্ম মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব ও দেবগণের জীবনুজ্জির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যতই দিন যাইবে ততই জগতে ঋষি, মহর্ষি, সাধু, মহাপুরুষ, দেবতা, প্রেরিত পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ এমনকি মানব সাধারণও মিশনের সত্য

বুঝিতে পারিবে। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আরও বলিয়াছেন মিশনের মধ্যে আরও পরে সর্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অগ্রণী মহাপুরুষগণ সে সমাজভুক্ত হইয়া প্রকৃত বিবাহ যোগ লাভ করিবে এবং সাধনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীর সাধন পূর্ণ হইলে সকলেই চিরকালের জন্য এই দেহেই জীবনুজ্জ্বল লাভ করিবে।

জীবনে তাঁহার সাধন প্রণালী যাহা দেখিয়াছি এবং তাঁহার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহার বিভিন্ন উপাসনার বিবরণ যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপিতে পাইয়াছি তাহাই এই জীবন চরিত্রের উপকরণ। তিনি কত উর্দ্ধে আছেন তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি না। তবু ধর্ম বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে এই মহান জীবন চরিত্র প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই জীবন ধারা প্রকাশ করিতে যদি কিছু ভ্রম ত্রুটি হইয়া থাকে তবে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন এই প্রার্থনা করি। দয়াময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি ধন্য।

বিনয়াবনত :

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

ভূমিকা

সর্ব ধর্মাবতার শ্রী শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী জগতকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর এই সর্ব ধর্মকে বিস্তৃতভাবে জগতে প্রচার ও প্রসারের জন্য শ্রী শ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজ দয়াময়ের আদেশ বাণী পাইয়া ১৩২৬ বাংলা সনের ৫ই পৌষ সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু মহারাজের প্রিয় শিষ্য সর্ব সাধক, গুপ্ত সাধক, আজীবন সর্ব ধর্ম মিশন সেক্রেটারী প্রয়াত কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার শ্রী শ্রীমৎ কর্তা মহারাজ গ্রন্থখানা রচনা / প্রকাশনা করেন। উক্ত মহান গ্রন্থে উনিশটি অধ্যায় রহিয়াছে। প্রথম অধ্যায় জন্ম, বংশ, পরিচয় ও শিক্ষা এবং শেষ উনিশতম অধ্যায়ে শান্তির সাধনা রহিয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে সাধন প্রয়াসি ভ্রাতা ভগ্নীগণের এক মহা মূল্যবান বিষয় সাধন প্রণালী ও আয়ুবৃদ্ধি রহিয়াছে। ইতোমধ্যে উক্ত গ্রন্থের সকল কপি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সর্ব ধর্মার্থীগণের ঐকান্তিক আগ্রহে এই মূল্যবান গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। এই গ্রন্থের ব্যয়ভার বহন করেন কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার নিবাসী বাবু স্বপন চন্দ্র ধর ও ইব্রাহিমপুর নিবাসী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভক্ত। আর

শ্রীশ্রীমৎ কর্তা মহারাজ

এই মহান গ্রন্থ প্রণয় (সংশোধন) কাজে যিনি শ্রম দিয়েছেন,
তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় দাদা নেত্রকোনা শ্রী শ্রী মা মনোরমা
আশ্রমের সম্মানিত সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণ নারায়ণ পাল।
অর্থদাতা, শ্রমদাতা সকলের প্রতি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং
কৃতজ্ঞতা রহিল।

দয়াময় প্রভু সকলের সর্বস্বাস্থ্য মঙ্গল করুন।

অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

বিনীত

শ্রী সন্তোষ চন্দ্র পাল

সেক্রেটারী- সর্ব ধর্ম মিশন

ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বাংলাদেশ।

শ্রীশ্রীমৎ কর্তা মহারাজ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা
জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মনোমোহন স্বামিজীর সঙ্গ লাভ ও তত্ত্ব জ্ঞানান্বেষণ	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	
পারিবারিক জীবন	২২
চতুর্থ অধ্যায়	
সর্ব ধর্ম মিশনের পূর্ব ইতিহাস	২৮
পঞ্চম অধ্যায়	
সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা	৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
হেড অফিস ও কৃষ্ণনগর আশ্রম.....	৫৫
সপ্তম অধ্যায়	
আশ্রম প্রতিষ্ঠা	৬৩
অষ্টম অধ্যায়	
তীর্থ ভ্রমণ	৮০
নবম অধ্যায়	
প্রচার কার্য	৮৮

দশম অধ্যায়	পৃষ্ঠা
সর্ব ধর্ম বিবাহ কার্য	৯৫
একাদশ অধ্যায়	
সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্ত বিশেষ	
লোক একজন আসিবেন	১০৪
দ্বাদশ অধ্যায়	
সর্ব ধর্ম মিশন ৩০০ বিশাল স্তম্ভের উপর স্থাপিত	১২৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
মিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন	১২৮
চতুর্দশ অধ্যায়	
মিশনের কার্য পরিচালনা	১৩৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	
কালীকচ্ছ প্রসঙ্গ	১৩৯
ষোড়শ অধ্যায়	
ভ্রমণ কাহিনী	১৪৩
সপ্তদশ অধ্যায়	
পরলোক জয়যাত্রা	১৫৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	
সর্ব ধর্মের মূলকথা	১৫৯
উনিশ অধ্যায়	
শান্তির সাধনা	১৯২

প্রথম অধ্যায় জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা

আমাদের জন্মভূমি ধর্মের দেশ। এদেশে যুগে যুগে কত অবতার, যোগী ঋষি ও ধর্মাত্মা মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ দেশের আকাশে, বাতাসে প্রতি ধূলিকণায় ধর্মের মহিমা চির বিরাজমান। তত্ত্বদর্শী ধর্মবিৎ সাধন বলে ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যখনই দেশে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ধর্ম সংস্থাপনার্থে ভগবান শরীরধারী হইয়া জগতে আবির্ভূত হন এবং অধর্মের বিনাশ করিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যে মহাপুরুষের মহান জীবন আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল। তিনি কত উর্দ্ধে আছেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমি তাহা ধারণাও করিতে পারি না। তবু ধর্ম বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে এবং অন্তরে শ্রীগুরুর কৃপা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহার এই দেব দুর্লভ মহান পবিত্র জীবন-চরিত লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি তিনি আমাদের গুরু-শ্রীশ্রীকর্তা মহারাজ। তিনি প্রসন্ন হউন এবং তাঁহার নামের জয় হউক।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার অন্তর্গত পুণ্যতোয়া গোমতী নদীর তীরস্থ বেগমাবাদ গ্রামে কোন এক মহৎ পাল বংশে ১২৮৯ বাংলা সনের ১৭ই বৈশাখ শনিবার জন্ম গ্রহন

করেন। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ পাল। মাতার নাম মতি রানী পাল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ পুণ্যশ্লোক ছিলেন। এতদেশে হিন্দু মুসলমানের নিকট তিনি লব বাবু নামে খ্যাত ছিলেন। সময় সময় তিনি পদব্রজে কোথায়ও রওয়ানা হইলে, জনসাধারণ জানিতে পারিলে কখন কখন মেয়েরা আনন্দে হুলুধ্বনি করিত, অনেক পুরুষ বিনম্র বদনে অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তাঁহার পূর্ব পুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী ছিলেন। কালশ্রোতে তাঁহার কোন এক পূর্ব পুরুষ মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া কুমিল্লা জেলার বেগমাবাদ গ্রামে আবাসভূমি নির্দিষ্ট করিয়া ছিলেন। বেগমাবাদ কুমিল্লা শহর হইতে ১৩ মাইল পশ্চিম উত্তর কোণে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তার উপর অবস্থিত। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা বড়ই ধর্ম প্রাণ ছিলেন। যখন বংশে কোন মহাপুরুষের জন্ম হয় তখন কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হন। সুসন্তান পাইয়া তাঁহার পিতা-মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। ভাগ্যবিপর্যয়ে অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জোষ্ঠা দুই ভগিনীর বিবাহের পর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার শোকাতুরা অসহায়া জননী তাঁহাকে এবং তাঁহার জোষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র পাল মহাশয়কে লইয়া কাঁঠালিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। তখন শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের বয়স ৭/৮ বৎসরের অধিক হইবে না।

কাঁঠালিয়া আসিয়াই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি প্রখর ছিল। পাঠেও খুব মনোযোগ ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পাঠশালার শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র পাল পণ্ডিত মহাশয়ের অতি প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের স্বহস্ত লিখিত ছাত্র জীবনের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। “আমার জন্মাবধি আমি ধর্ম অন্বেষণ করি নাই। কিন্তু যখন পাঠশালায় পড়িতাম তখনই সময় সময় আমার গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের কথা আমি লোক মুখে শুনিতাম। কখনো কখনো বা ‘দয়াময়’ নামের লোক একত্র বসিয়া গান করিত। সাধন ভজন বা নাম জপ, মনন ও ধ্যান হইত। আমরা তখন ছোট ছেলে মানুষ, দুই চার জন মিলিয়া আমরা সঙ্গতের কাছে দাঁড়াইয়া সব দেখিতাম। উপাসনা শেষ হইলে আমরা সকলে প্রসাদ পাইতাম। তখনকার দিন অন্য রকম ছিল। গ্রামের সকল পরিবারের স্ত্রী পুরুষ কেহই দয়াময়ের কথা বড় একটা শুনিতে পারিত না। সকলেই নামের লোকদের উপর অত্যাচার করিত। দেখা গিয়াছে যে পূজা পার্বণ উপলক্ষে ইহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ মন্ত্র পড়ে নাই। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামীর আগমন হইলে গ্রাম শুদ্ধ তাঁহার কাছে আসিত। কেহ বা সাধন লাভের

জন্য, কেহ বা রোগ মুক্তির কামনায়, কেহ কোন সংসার বাসনা লইয়া তাঁহার নিকট আসিত। তিনি সকলের প্রশ্নেরই উত্তর দিতেন ও প্রয়োজন বোধ করিলে নাম দিতেন। সুতরাং তাঁহার কথাবার্তা নিয়া গ্রামে তখন বড় আন্দোলন হইত। তিনি সকলের মনের কথা বলিতে পারিতেন। তিনি সকলকে সুন্দর প্রশালীতে উপদেশ দিতেন এবং প্রত্যেকের জীবনের উপযোগিতা বুঝিয়াই পথ প্রদর্শন করিতেন। এ ভাবে অনেক স্থলে তাঁহার ভক্তগণের সংখ্যা বাড়িতেছিল। তিনি সমাজে ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া হিন্দুদের সহিত তাঁহার তেমন মেলামেশা ছিল না। সময় সময় শ্রীশ্রী গুরুদেবের প্রসাদ গ্রহণ করে বলিয়া দয়াময় নামের লোকদের প্রতি সমাজ অসদ্ব্যবহার করিত।

আমি যখন ইব্রাহিমপুর মধ্য বাংলা স্কুলে পড়ি তখন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। ইব্রাহিমপুর গ্রামে তাঁহার কোন এক ভক্তের বাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন। স্কুলে যাইবার কালে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র শীল মহাশয়ের পূর্ব ভিটির ঘরে উত্তর দিকের চৌকিতে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া কয়েকজন ভদ্র লোক সেই চৌকিতেই উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। মেঝেতে অপর সাধারণ ভক্তগণ বসিয়াছিল। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়াই স্কুলে চলিয়া গেলাম। আমার মনে তখনও ততটা ধর্ম ভাব জাগে নাই। তখন আমি মধ্য বাংলা শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম।

আমার মাসতুত ভাই স্বর্গীয় গুরুদয়াল পালকে শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজ বড় ভালবাসিতেন। কাঁঠালিয়া গ্রামেই তাঁহার বাড়ী ছিল। আমাদের বাড়ী সংলগ্ন উত্তর বাড়ীতেই তিনি বাস করিতেন। তাঁহার মা, পিসী, স্ত্রী ও ছোট ভাই সকলেই শ্রীমৎ স্বামীজিকে গুরু করিয়া ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই দাদাই আমার নিকট ছোট বেলাতে কত রকমের কথা বলিতেন। আমি শুনিয়া শুনিয়া কত চিত্র আঁকিতাম। তিনি যে সকল উৎসবে গিয়া নানাবিধ সাধন করিতেন, তত্ত্ব শুনিতেন ও ভবিষ্যৎ জগতের অভিনব সমাচার আনিতেন আমাদের ঘরে বসিলে তাঁহাকে আমি ঐ উৎসবদির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতাম। জানিনা তিনিও কি প্রেরণায় সমুদয় বিশেষ ভাবে আমাকে বলিতেন। দেখিতাম তিনি আর কাহাকেও পৃথিবীতে মানিতেন না। এক দয়াময়ের সেবাই ঈশ্বরের আদর্শ ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার মুখেই শুনিতো পাই যে মরা মানুষ আবার আসিয়া ভাই বন্ধুর নিকটে পুনরায় পরিচিত হইবে, কেহই আর মৃত্যুর অধীন হইবে না। এরূপ সূসমাচার আজগুবি খবর তিনি আমাদের শুনাইতেন। গ্রামের কেহই এ কথার যথার্থ বুঝিত না,- না বুঝিয়াই এই সুমদয় ব্যাপার লইয়া যুবক বৃদ্ধ সকলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। কখন কখন এই নামের লোকদের প্রতিবেশিরা বা সমাজের নেতারা ইহাদিগকে তাড়না করিত। গ্রামের উৎসব আমোদেও এই লোকদের যোগ ছিল না। ইহারা সেই নামের আনন্দে স্বামীজীর আজ্ঞাধীন হইয়াই জীবন পথে অগ্রসর হইত। নিয়মিত নামই ইহারা করিতেন। রোগাদি নৈসর্গিক ব্যাধি মৃত্যুর

আশঙ্কিতে ইহারা কেবল ঈশ্বরের পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়তির উপর বিশ্বাস রাখিতেন। তাহারা লেখাপড়া জানিতেন না। সাধারণ গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহাদের কেহ কেহ বা কিছু শিখিয়াছিলেন। কেহ বা গ্রাম্য পাটোয়ারী করিতেন, কেহ বা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। খুব বিদ্বান লোকের সংখ্যা স্বামিজীর শিষ্যদের মধ্যে কমই ছিল। নানা কার্যোপলক্ষে অনেক শিক্ষিত উকিল, ব্যারিষ্টার বা বিদ্বান তাঁহাকে মানিতেন ও তাঁহার উপদেশানুসারে নাম জপিতেন।

আমি কাঁঠালিয়া গ্রামে বাস করিতাম। গ্রামে আর একজন দয়াময় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নাম কৈলাস চন্দ্র পাল আমার শিক্ষা গুরু। দাদা শ্রীযুক্ত গুরু দয়াল পাল এবং এই পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটই আমি ধর্ম জীবনে তত্ত্ব জানিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমৎ স্বামিজীর বাড়ী না গেলেও আমি ইহাদের মুখেই দয়াময় নামের শক্তির কথা শ্রবণ করি। এই দুইজনের সঙ্গে আর কয়েক জনের আন্তরিকতা ছিল। তাঁহারা ইব্রাহিমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শুনিয়াছি স্বামিজীর এমন আদেশ ছিল তাঁহারা যেন সপ্তাহে একবার রবিবার বিকালে একত্র হয় এবং ঈশ্বরের প্রসঙ্গে কিছুকাল কীর্তন করেন এই সমবেত ভাবের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমি সময় সময় আমার গুরুদেবের কথা শুনিতাম। কালীকণ্ঠের সকল কথা তাঁহারা আনন্দের সহিত বর্ণনা করিতেন। আমি কোন অজ্ঞেয় প্রেরণায় সকল ঘটনা এবং আমূল

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতাম কত আশা, কত ভাবনা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিত। আমি ক্রমে ক্রমে সর্ব ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিলাম।

এ সময় আমার মাতৃ বিয়োগ হয়। সুতরাং নিরুপায় হইয়া আমি কাঁঠালিয়া গ্রামেই আমার জোষ্ঠা ভগিনীর বাড়ীতে চলিয়া যাই। তিনি আমাকে সহোদর বলিয়া অপূর্ব স্নেহের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীতেই আমার শিক্ষা গুরু স্বর্গীয় কৈলাস পণ্ডিত মহাশয়ের বাসস্থান ছিল। গ্রামের মধ্যে শিক্ষিত লোক বলিয়া সকলেই উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে মান্য করিত। রোজ রাত্রিতে বাড়ীর বৈঠক ঘরে ইনি সুন্দর সহজ ভাবে কীর্তন করিতেন। শুনিয়া মনে করিতাম গানের সুরে অফুরন্ত মাধুরী ঝড়িতেছে। কোন দিন আরতির পরে দু'চারটি অন্য গীতও তিনি গাহিতেন।

প্রেমসিদ্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময় ইত্যাদি কীর্তন। এই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতাম কেন বা এই সুরসাল আরতির শক্তিতে আমি ডুবিতেছি-ইহার নতুন ভাব কমিতেছে না কেন? যতই শুনিতেছি কেবল অমৃতের নির্বার ঝড়িতেছে। এখন জানিতেছি কেন এই সঙ্গীতের প্রভাবে মাদৃশ এই পতিতের জীবন পবিত্র হইয়াছিল। কিছুদিন গেলে আমি নাম নিজে নিজে ঠিক করিয়া জপিতাম। মনে মনে শ্রী আনন্দ ছবি রাখিতাম। দয়াময়ের কৃপাতেই কখনও বা দুই একটি অচিন্তনীয় দৃশ্য ফুটিয়া উঠিত। সময় সময় স্বপ্ন যোগে কত সুন্দর করুণার নিদর্শন আসিত-আমি

অতীব আনন্দের সহিত সে সমুদয় স্মৃতির স্বপ্ন সাহিত্য বাছিয়া বাছিয়া আঁকিতাম। আজও তখনকার স্বপ্ন গুলি মনে আছে-জীবন্ত ভাবে উহাদের শক্তি আমার জীবনের উপায় করিয়া দিতেছে।

আমাদের গ্রামে সে সময় আরাধ্য গুরু দেবের আগমন হইয়াছিল। দেশের সকল শিষ্যদের বাড়ীতে তিনি সাধারণতঃ বর্ষার সময়ই আসিতেন। আহায়ে তাঁহার নিয়ম ছিল না। আমিষ নিরামিষ আহায়ে তিনি কোন রকম আপত্তি করিতেন না। জীবনে তিনি কেবল নামেই আত্মোন্নতির পন্থা অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার ধ্যানই উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি সকলকে বলিতেন এ জগতের দুর্দ্দিন আর থাকিবে না। মৃত্যুর অধিকার পৃথিবীতে বেশী দিন থাকিবে না। অমৃতের শক্তিতে মানুষ পূর্ণ বিবাহের যোগ লাভের পর অমর হইবে।

আমি ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে নবীনগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাই। আমি নিতান্ত গরীবের ছেলে এবং পড়িতে পারি এরূপ সঙ্গতি ও সম্ভাবনা ছিল না। ভয় হইতো আমি পাছে ইংরেজী পড়িতে না পারি। মধ্য বাংলার বৃত্তিতেই সে সময় আমার স্কুলের খরচপত্র চলিত। নবীনগর স্কুলের বোর্ডিংএ আমি থাকিতাম। একদিন মনে হইল শ্রী শ্রীমৎ আনন্দ স্বামিজীকে আমার অবস্থা জানাইয়া চিঠি লিখি। তিনি সকলের ভাবী জীবন জানিতে পারেন এবং জীবনের দুরবস্থা বিদূরিত করিতে জানেন। তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলেই আমার উপায় হইতে পারে। আমি

তাঁহার শ্রীপদে চিঠি দিলাম। পত্রোত্তরে শ্রীআনন্দ আমাকে জীবনের আশামূলক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জানিতে দেন এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইব এ খবর পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদসঙ্গে একটি নামও জপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন-ইহাই আমার গুরু করণ-ইনিই আমার গুরু-জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

আমি এ সময় আর কাহাকেও মানিতাম না। অন্তরে আমার সকল প্রকার আদর্শের ভাব এই মহাপুরুষেই জমিতেছিল। আমি অন্তরে অন্তরে এই দয়াময় নামের প্রতি অনুরক্ত হইতেছিলাম। এভাবেই আমার ধর্ম জীবনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

আমার ভগিনীর বাড়ীতেই সকল রকমের ধর্মের আন্দোলন হইত। কালিকাচের গাছ তলার সাধন সংবাদাদি এই বাড়ীতেই আমি স্বর্গীয় কৈলাস পন্ডিতের মুখে জানিতে পারি। কোন কোন দিন স্বপ্ন যোগে শ্রী আনন্দ মহারাজ দর্শন দিতেন-উপদেশাদি জানাইতেন। এভাবেই মনের প্রবল আকর্ষণ শ্রীশ্রী গুরুদেবের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু দয়াময় নামের আমূল বিবরণ তখনও শুনিতে পারি নাই।

১৩০৬ বাংলা সনের আশ্বিন মাসের কথা। গুরুজী আমাদের বাড়ীতে (আমার ভগিনীর বাড়ীই আমার বাড়ী মনে হইত) আসিবেন শুনিলাম। আমি তখন নবীনগর স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে (Class VIII) পড়ি। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। শ্রীশ্রী গুরুদেব তখন ইব্রাহিমপুর নিবাসী স্বর্গীয় উদয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। পালকি নিয়াই আমরা

তঁাহাকে কাঁঠালিয়া কৈলাশ পন্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে আনিতে যাই। উক্ত পন্ডিত মহাশয়ের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর গুরুজী কাঁঠালিয়া আসিতে স্বীকার করেন। আমি এই জীবনে প্রথম শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ চরণে প্রণত হইলাম। তঁাহার দেহ অপূর্ব জ্যোতির্মন্ডিত দেখিলাম। কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণের মিশ্রণ শুভ্র জ্যোতির মধ্যে দেখিলাম তিনি কত পবিত্র। আমি হীন নরাধম বলিয়া আমার মনে তঁাহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল। তথাপি আমি সময়োচিত ভাবের প্রেরণায় সেই বিমল চরণ স্পর্শ করিলাম। ভক্তি করিয়া দাঁড়াইলে সেই জগৎ বরণ্য মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি পড়?”

আমি উত্তরে বলিলাম ‘তৃতীয় শ্রেণীতে (3rd class) পড়ি’। গুরুজী আমাদের বাড়ীতে সেই রাত্রি ছিলেন। রাত্রিতে বৈঠক ঘরে কীর্তন হইল; কীর্তনান্তে লুট হইল এবং তিনি জন প্রতি ২টি বাতাসা দিতে বলিলেন। শেষে দেখা গেল বাতাসা একটিও আর নাই। প্রত্যেকেই আপন আপন প্রসাদ পাইয়াছে। ঐ রাত্রিতেই গ্রামের কয়েক জন বৈষ্ণব ও অন্য লোকজন তঁাহার কাছে বসিয়া গান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের পর বৈষ্ণব বাবাজী উহার অর্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামিজী পরিস্কার ভাবে অর্থ বলিয়া দিলেন। বাবাজী স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ধর্মের রং কী? জগতের আদি অন্ত আছে কি না? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন- “ধর্মের রং সাদা” জগতের আদি ও নাই অন্ত ও নাই, জগত

চলছে। তিনি একটু তোতলা স্বরে কখনো কখনো কথা বলিতেন। আজও মনে আছে সেই স্বর সেই ভঙ্গী।

আমি আরও শুনিয়াছিলাম তিনি সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ। লোক চক্ষুর অন্তরালে যাহা রহিয়াছে তঁাহার চক্ষুতে উহা নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। এজন্য আমি ঘরের উত্তর পূর্ব কোণে দূরে বসিয়া একান্ত মনে নাম জপ করিতে ছিলাম। ধারণা ছিল তিনি আমাকে ডাক দিবেন। তিনিও আমাকে দেখিতেছেন। নাম করিতে করিতে সকলের সহিত আমিও উপদেশ শুনিতেছিলাম। আমার ডাক পড়িল না। আমি ঘুমাইতে গেলাম। ভোর বেলা উঠিয়া তিনি রওনা হইবেন। আমি তঁাহার নিকট নামের জন্য দাঁড়াইলাম উহাও অন্য একজনের অনুরোধে। তিনি এক নাম লিখিয়া লইতে বলিলেন। আমি লিখিয়া প্রস্থান করিলাম। তিনি আমাকে আপন ভাবিয়া স্নেহ করিতেছেন না দেখিয়া মনে নিদারুণ লাগিয়াছিল। তবে মনে অভিমান জাগিয়াছিল। ভাবিলাম ভালবাসিব এবং ভালবাসার বদলে ভালবাসা আদায় করিয়া লইব। ১৩০৭ বাংলা সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ আমার গুরুজীর তিরোধান হইয়াছিল। জীবনে তঁাহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সুযোগ আমার আর হয় নাই।”

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তখন স্কুলে পড়িতেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় কৈলাস পন্ডিত মহাশয় এবং স্বর্গীয় গুরু দয়াল পাল

মহাশয়ের নিকট শ্রী আনন্দের অফুরন্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া সর্ব ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠেন। প্রথমতঃ গ্রামের পাঠশালা হইতে প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইব্রাহিমপুর মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্তি হইয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অচিরেই স্বীয় প্রতিভা বলে তিনি মধ্য বাংলা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর তিনি নবীনগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া ছাত্রবাসে থাকিয়াই পড়িতে লাগিলেন। বৃত্তির টাকা দ্বারাই তখনকার লেখা পড়ার খরচ চলিত। ছাত্রবাসে থাকাকালীন শিক্ষার আরও অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্কুলের সুযোগ্য হেড মাস্টার চন্দ্র কান্ত ঘোষ মহাশয় তাঁহার চরিত্র ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন। অচিরেই আদর্শ ছাত্র বলিয়া সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। বিদ্যালয়ের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। ১৩০৯ বাংলা সনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপর তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হইয়া অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই কলেজ হইতেই তিনি সম্মানে আই,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি না পাইলেও কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন।

তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার খবর জানিয়া কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বর্গীয় ডেক্সর চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চপলা সুন্দরী পালকে বিবাহ দিবার মানসে তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আহ্বান করেন। অতঃপর যথা সময়ে এই পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসরের অধিক হইবে না। স্কুলে অধ্যয়নকালে বিদ্যাভ্যাস এবং ধর্ম সাধনা উভয় লইয়াই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। অহোরাত্র বিদ্যানুশীলন এবং সাধনা লইয়া ব্যাপ্ত থাকিতেন। বি,এ, পড়িবার সময় তাঁহার কুন্ডলিনী শক্তির উন্মেষ হয়। এ সময় বিবেকীর মত হইয়া তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া অহোরাত্র কেবল সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তখন পাঠে তাঁহার মোটেই মনোযোগ ছিল না। সুতরাং বি,এ, পরীক্ষা দিলেও তিনি প্রথমবার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলেজে পড়িবার সময় অধ্যাপকগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। পাঠাভ্যাস কালে কখন কখন তিনি এমন সূক্ষত্বের অবতারণা করিতেন যে অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিব্রত হইয়া পড়িতেন। সহপাঠীগণও তাঁহার গভীর জ্ঞানানুশীলনের চিন্তা করিতে করিতে অবাক হইত। এতেই কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে তাঁহার নাম ও যশ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোমোহন স্বামিজীর সঙ্গলাভ ও তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণ

শ্রী আনন্দের অন্তর্ধানের পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল। তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুসন্ধানে অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল-“আমি জীবনে স্বামিজীকে দুইবার মাত্র দেখিয়াছি। তাঁহার কথা চিন্তা করিতে আমার সংসার সাধনাতে অধিকার আসিয়াছে- জগতের সঙ্গে জীবনের যোগ হইয়াছে- ভাবের সহিত কথার একতার স্বভাব হইতেছে। নিজের স্বভাবেও উত্তরোত্তর সাধনের ভাব জাগিতেছে। আমার মনের যত সংগ্রাম ছিল-বহির্মুখী আকর্ষণ ছিল-সমস্তই পরমেশ্বরের ভাবে আমাকে সহায়তা করিতেছে। তিনি আমাদের সর্বদাই ভালবাসেন ও আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কোন ভাবের বিকার নাই। তিনি সর্বদাই একরূপ আছেন। যে দিন মুসার সহিত তিনি আলাপ করিতেন-হযরত ঈশাকে উপদেশ দিতেন, সে দিন তাঁহার যে অবস্থা আজও তাহাই আছে। বাস্তবিক পবিত্রাত্মা, ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের মধ্যেই পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভাবি, বর্তমান এবং অতীত কোন কালেই তাঁহার পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তাঁহাকে আমাদের সহিত এক জানিলেই আমাদের উপায় হইবে এবং বিশেষ ভাবে শান্তি মিলিবে। যিনি এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চাহেন না তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে ও

সাধনার পর সাধন করিয়া তিনি এই সত্যে পৌঁছিবেন। যে দিন মানুষ পরস্পরকে জানিতে পারিবে এবং জীবের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে সেই দিন মহিতলে ঈশ্বরের সিংহাসন আবির্ভূত হইবে। মানুষের সহিত মানুষের ঐক্য যোগে আসিলেই সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইবে-দানের শক্তিতে জগতের উপকার সাধন করিতে আমাদের মন পাগল হইবে। বাস্তবিক সিদ্ধ পুরুষেরা পরের অনিষ্ট দেখিলেই কাঁদিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন যেন আমাদের উপায় করিবার নিমিত্ত অহর্নিশ ব্যাকুল হইতে থাকে, তেমন আবার স্বাধীনতার ভাবেও ঈশ্বরকে পাইয়া আনন্দে ইহাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ সংসারে থাকে না। যে দিন এই কথার প্রতি সকলের দৃষ্টি হইবে, সে দিন ইহাতেই কার্যের বিশেষ প্রণালী দেখিবে।

শ্রীমৎ স্বামিজীর সহিত আমার একত্র থাকিবার সুবিধা ছিল না। মনে ধর্মের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আসিত-পাপের পরিণাম চিন্তায় ভয় জাগিত। কয়েক বৎসর গেলে আমি একদিন বসিয়া “আলো ও ছায়া” বহিখানা পড়িতেছিলাম। হৃদয়ের আবেগে তখনও নয়ন প্রান্তে অশ্রু দেখা দিয়াছিল। আমার মনে বড় কষ্ট ছিল। আমার উপায় কি হইবে? আমি কিসে বা মলিন মনের রাশিকৃত পাপ বিধৌত করি? পথের তালাসে ছিলাম এবং দেখিতাম আমাদের প্রতি আড়ালে কে যেন আছেন। তিনি কে জানি না কিন্তু পাপের প্রেরণাতে তাঁহার ব্যবস্থার সীমা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না এই চিন্তাতেই শেষে মনের সমস্ত ভাবের উত্থান পতনে স্থির

করিয়াছিলাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কার্য কেহ করিতে পারে না এবং তিনি সকল জীবের কর্ম শৃঙ্খল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অবধারিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কথার সঠিক খবর পাই নাই। বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম তত্ত্ব ও পড়িলাম। পক্ষান্তরে গীতার অনুবাদ বা গীতার টীকা কিছু দেখিলাম, মূলের আবৃত্তি করিলাম-আমি দেখিলাম না আমার সেই কথা। যদিও গীতায় লেখা আছে-

“ঈশ্বরো সর্বভূতানাম হৃদ্যেশেহর্জুনঃ তিষ্ঠতি

ভ্রাময়ণ্ সর্ব ভূতানি যন্তারুঢ়ানি মায়য়া ॥ ”

তথাপি আমার শান্তি হইল না আমি সেই সোজা কথা পাইলাম না। গীতার আদিতে আবার ভগবানের উপদেশ আছে “কার্য কর” ইত্যাদি। সেই জন্য আমি খুঁজিতেছিলাম সহজ ভাবে পরিষ্কার থাকিবে যে, আমাদের অদৃষ্ট খন্ডনীয় নহে। সে দিন চৈত্র মাস ছিল। উত্তর বাড়ীর গুরু দয়াল দাদা আমাকে ডাকিলেন, আমিও গেলাম। তিনি আমার হাতে ছোটখাট রকমের একটু লম্বা একখানা ছাপানো গ্রন্থ দিলেন। তিনি ইহার কথা শুনিতে চাহিলেন, আমি পড়িতে লাগিলাম। এক উক্তি প্রথমে ছিল, উহা সে দিন তত বুঝি নাই। তার পরের কথাতে ও একটু সুখ পাই নাই। বাস্তবিক তত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি নাই। উহা বড় কঠিন ভাবের সমস্যা ছিল। পরের এই তিন নম্বরের উক্তিতেই আমি পুস্তক রাখিয়া চুপ করিয়া বসিলাম-দেখিলাম জীবনের শক্তি পাইয়াছি। নামের সঙ্গে যে তত্ত্ব লুকাইয়া ছিল তাহা মিলিয়াছে। পরের দেশে যে বস্তুর সন্ধান করিতেছিলাম উহা

গৃহেই রহিয়াছে। সত্যই লেখা আছে- “মনুষ্য নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন” এই প্রবচনটিতে আমার অতীতের বোঝা নামিয়ে গেল। আমি নিশ্চিত হইলাম এবং ভাবিলাম-এই আমার ধর্ম। এতদিনে আমার পথ ঠিক হইয়াছে। আর বই বেশি পড়িলাম না, চলিয়া গেলাম। এই বহিতে স্বামিজীর ধর্মের সকল সত্য আছে। এই গ্রন্থের নাম-“প্রকৃত তত্ত্ব”।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তাঁহার ইষ্ট দেব শ্রী আনন্দকে জীবনে দুইবার দর্শন করিয়াছিলেন। ১৩০৬ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে তাঁহাকে শেষ দর্শন করেন। তখন তিনি নবীনগর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তারপর ১৩০৭ বাংলা সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজ পরলোক গমন করেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধানে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। এতদ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের স্বহস্ত লিখিত উক্তি প্রদত্ত হইল-

“কিছুদিন গেলে গুরুদেবের একজন অতি আদরের শিষ্য আমাদের বাড়ীর কাছে আসিলেন। তিনি আমার পরবর্ত্তী আমলের ধর্মোপদেষ্টা। ইনি সেই আরাধ্য মহাপুরুষের চরণ সেবাতেই জীবন মন ন্যস্ত করিয়া- ছিলেন। তাঁহাকে আমি পাইলাম। শ্রীশ্রীমৎ আচার্য মহারাজের কৃপাতেই ইনি দয়াময় নামের দীক্ষা পাইয়া ছিলেন। স্বামিজীকে আদর্শ মানিতেন। গুরু বলিয়া এই মানুষটির অফুরন্ত নয়ন ঝড়িত। ইনি আমাকে স্বামিজীর সঙ্গীদের কথা, নামের কথা, শিক্ষার্থীদের কথা এবং তাঁহার জীবনী বলিতেন। আমার তখন অনুতাপের আগুন ভিতরে জ্বলিতেছিল।

আমি এই মানুষটিকে পাইয়া হৃদয় খুলিয়া দিলাম। তিনি অপার্থিব আদরের সহিত আমাকে আশ্বস্ত করিলেন। এক রাত্রিতে এই মহাপুরুষের সহিত শ্রীমৎ আনন্দ চন্দ্র দে (ইব্রাহিমপুর) মহাশয়ের আসন ঘরে দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন এবং পরদিন প্রাতে শ্রীমৎ গুরু দয়াল দাদার গৃহে সকালে মিলিত হইলাম। তিনি দুপুরে উপাসনায় বসিলেন। তিনি নাম দিতে লাগিলেন। সকলে নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। তারপর তিনি চলিয়া গেলে তিনি যে আশীর্বাদ করিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। “তোমার ধর্ম জীবন লাভ হইবে-ধ্রুব সত্য।” এই মহামূল্য কথাই এই মহাপুরুষের মুখ হইতে বাহির হইল। এদিকে ইহাকে সকলেই চিনে। ইনিই ‘মলয়া’র প্রণেতা শ্রীমৎ মনোমোহন দত্ত।

এই মহাপুরুষের সঙ্গেই আমি ধর্ম জীবনের পরিচয় লাভ করি। স্বামিজীর গ্রন্থে তাঁহার পথেই আমার সোয়াস্তি হইবে স্থির করিলাম। এখন তিনি ইহধামে নাই, সুতরাং মনের মানুষ শ্রীমৎ মনোমোহন বাবুর আশ্রয় নিলাম। তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন, নাম দিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে সকল তত্ত্বাবগতি হইতে পারে এ ভাবে আমাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতায় আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার সরল ধর্মোপদেশে আমার মন উদ্ভীষিত হইয়াছিল। ইনি আমাকে ধর্মের সঙ্গী করিয়াছিলেন। আর ইহার প্রাণের ভিতর দিয়া যে সত্যের আলো

আমাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল তজ্জন্য আমার গুরুদেব শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজের চরণে আমি নমস্কার করি।

আমার সহিত পরিচয়ের কিছুকাল পরেই শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজী উল্লতির শিখরে উঠিয়াছিলেন। আমাদের মনের ভাব বুঝিয়া, হৃদয়ের বৃত্তি দেখিয়া সাধনের উপযোগী নাম দিতেন। সময় সময় আমাদের নিকট আনন্দ কাহিনী বলিতেন। উপাসনাতে বসিলে আমাদের সকলকেই এক প্রার্থনা, এক নাম ও একই রকম ধ্যান দিতেন, পৃথক বিষয় কাহারো নিমিত্ত ছিল না। ঈশ্বরের আদেশ ক্রমে সকল নির্দ্বারণ করিতেন, এই জন্য আমাদের উপাসনাতে ইনি আচার্য্য হইতেন; উপাসনায় গীত হইত। সুতরাং নির্দিষ্ট প্রার্থনা জপাদি কিছুই ছিল না। ঈশ্বরের সমীপে যে দিন যে রকমের নির্দিষ্ট সাধনের ক্রম পাইত তদনুসারেই উপাসনায় প্রার্থনা, গীত, জপাদির ব্যবস্থা করিতেন। কোন দিন বা একজনের এক নাম, অন্য জনের অন্য নাম-কোন দিন বা সকলের নিমিত্তে একই নাম তিনি বাছিয়া লইতেন।

একদা শ্রীমৎ মনোমোহন দত্ত আমাকে বলিলেন, “দেখ লব গুরু তত্ত্ব, স্ত্রী-তত্ত্ব ও পরলোক তত্ত্বের বিশেষ সাধন তোমার দ্বারাই উদ্ধার হইবে-ইহাই বুঝিতেছি। তিনি যে দিন শ্রীশ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের নিকটে প্রথমে ধর্মার্থী হইয়াছিল-উহার কথা বলিয়া আমাদের অন্তরে সেই অনন্ত মুহূর্ত্তের সুসমাচার জ্ঞাপন করিতেন। “ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়”-এই কথাই নাকি তাঁহার গুরুদেব প্রথম উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিতেন যে

দিন যে বিষয় দেখিতাম বা মনে করিতাম কিংবা স্বপ্নে জানিতাম তিনি অনায়াসে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিতেন। তাঁহার অজ্ঞেয় কিছু ছিল না। তিনি স্বপ্নের বিবরণ প্রত্যেককে বলিতেন। তিনি স্বপ্ন বা কোন দর্শন শুভ না হইলে ইহার প্রতিকার বলিয়া দিতেন। সাধারণতঃ নামই জপ করিতে বলিতেন।

এই মহাত্মার নিকট শুনিয়াছি তাঁহার গুরুজী শ্রীমৎ স্বামিজী একদিন তাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া ছিলেন। ১৩০৬ বাংলা সনে কালীকচ্ছ শারদীয় ব্রাহ্মোৎসবে তিনি গিয়াছিলেন। বাড়ী রওনা হইবেন এমন সময় তিনি স্বামিজীকে নমস্কার করিতে গেলেন। তখন স্বামিজী তাঁহার বাম হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন-“মনোমোহন তুমি কি দেখিতেছ?” তিনি চাহিলেন এবং গুরুদেবকে জানাইলেন, “বাবা, আমার ও আপনার শরীর ধবল বর্ণ হইয়া গিয়াছে।” অমনি হাত খানাকে ঝাকি দিয়া স্বামিজী উত্তর করিলেন, “যাও বৎস পাশ হইয়াছ। এসো গিয়া, কোন ভয় নাই।’ এই শেষ কথা তিনি আমাদিগকে বলিতেন।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আজন্ম সাধক ছিলেন। সাধন করিয়াই তিনি ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজীকে পাইয়াই তিনি রীতিমত সাধন ভজন করিয়াই ধর্মের উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উভয়ের এক প্রাণতা ছিল। শ্রী আনন্দের ধর্মের সত্য লাভ করিবার জন্য উভয়েই সর্বদা আলোচনা করিতেন এবং সাধন করিতেন। এতদ্ব্যতীত

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ প্রকৃত তত্ত্ব, যোগ প্রণালী, সর্ব ধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী, সর্ব ধর্ম গীত ১ম ভাগ, সর্ব ধর্ম গীত ২য় ভাগ খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সর্ব ধর্মের সকল সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিতেন। সময় সময় তিনি প্রকৃত তত্ত্ব মুখস্থ করিয়া সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে আমাদিগকেও উপদেশ দিতেন। কিশোর বয়সেই তিনি যে কোন বিষয় একটু চিন্তা করিলেই সব বলিয়া দিতে পারিতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে একটু চিন্তা করিলেই যে কোন বিষয় তাঁহার চক্ষের সামনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি আজীবন জগতের হিতার্থেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সর্ব ধর্মের সামঞ্জস্য ও সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অগোচর কিছুই থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ১৩১০ বাংলা সনের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্ব প্রথম শ্রী আনন্দ ধাম দর্শন করিবার জন্য কালীকচ্ছ গমন করেন। তখন তাঁহার শ্রী গুরুর তিরোধান হইয়াছিল। তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীশ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন প্রেম পুরীর সমুদয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরম ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র বাবু শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে পাইয়া তাঁহাকে সহোদর ছোট ভাইয়ের মত দেখিতেন। সর্ব ধর্মের অনেক কথা তিনি শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে জানাইয়াছিলেন। কিভাবে স্বামিজী মহারাজ কার্য্য করিতেন-সাধন ভজন করিতেন এবং কি প্রকারে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি সকল ঘটনা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট তিনি সর্ব ধর্মের বহু আধ্যাত্মিক জগতের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় পারিবারিক জীবন

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বি,এ, পাশ করিয়া প্রথমতঃ ঢাকা জেলার নরসিংদীর নিকটবর্তী সাটিরপাড়া হাইস্কুলের হেড মাষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল কার্য্য করেন। তৎপর নবীনগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এসিষ্টেন্ট শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষকতা করেন। এই স্কুল হইতেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। সেই সময় তিনি সপরিবারে তথায় থাকিয়া স্কুলের কার্য্য করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষাবিদ সমবেত হইয়াছিলেন। সভার মধ্য হইতে জনৈক স্থানীয় মুন্সেফ বাবু বলিলেন “শ্রীযুক্ত লব বাবুর বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে দূর হইতে যাহা শুনিতাম আজ প্রত্যক্ষ ভাবে সব উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি”। দুই বৎসরের অধিক কাল এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া পরে ইব্রাহিমপুর হাইস্কুলে এসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এই স্কুলে তিনি ন্যূনাধিক দুই বৎসর কাল ছিলেন।

তাঁহার শিক্ষা প্রণালী ও বিদ্যাবত্তার কথা ক্রমশঃই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এজন্য উজানচর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সাদরে আহবান করেন। তিনি এই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। তখন কুমিল্লা জেলার মধ্যে

উজানচর স্কুলের খুব সুনাম ছিল। এই স্কুলে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যাও ছিল অধিক। বহু ছাত্র স্কুল বোর্ডিং-এ থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। গ্রাম্য স্কুলে এত বড় ছাত্রাবাস তখনকার দিনে আর কোথায়ও দেখা যাইত না। অনেক মেধাবী ছাত্র এই স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

১৩২৫ বাংলা সনে উজানচর হাই স্কুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার হাইস্কুল শিক্ষকদের এক সম্মেলন হইয়াছিল। আমি তখন ফতেপুর হাইস্কুলের ছাত্র-ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। আমাদের স্কুলের দুই জন শিক্ষক ঐ সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের কথা লোক মুখে শুনিতাম। আমিও সুযোগ পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন মানসে তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলাম। সম্মেলনের দিন শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। সম্মেলনের দিন প্রাতঃকালে বাসায় গিয়া আমি শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। ইহাই আমার প্রথম শ্রীগুরু চরণ দর্শন লাভ। তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমি আত্মসমর্পণ করিয়া “নাম” প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে নাম দিলেন। তাঁহাকেই জীবনের আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া বিদায় হইলাম।

শিক্ষক সম্মেলনের পরদিন সম্মেলনের সভাপতি পূর্ব বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত হইয়া ধর্ম সম্পর্কে এক

ভাষন দান করেন। বিদ্যমন্ডলী তাঁহার মধু মাখা (অনুপম) ধর্ম প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিতেন “স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে কাজের চাপ অনেক বাড়ে এতে সাধন ভজনের ক্ষতি হয়।” এ জন্য তিনি সহকারী শিক্ষক হিসাবে স্কুলে কাজ করিতেন।

উজানচর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার কালে দেশের বহু লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারেন। কেহ ধর্ম লাভের আশায়, কেহ রোগ মুক্তির জন্য, কেহ বা কোন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত অসংখ্য লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইত। “দয়াময়” নামদ্বারাই তিনি সকল প্রতিকার করিতেন। কঠিন অবস্থা হইলে সময় সময় যজ্ঞ করিতেন। পরোপকার করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইলে বহু গরীব, দুঃখী ও বিপন্নকে তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি সহজে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। হাতে টাকা না থাকিলে ধার করিয়াও তিনি প্রার্থীকে সাহায্য করিতেন। শুনিয়াছি কোন সময় দান করিতে অসমর্থ হইলে নীরবে বসিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের পরিধি ছিল না। তিনি আর্ন্ত জনকে সর্বদাই সাহায্য করিতেন এবং শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই তিনি আশ্রয় দিতেন। ইষ্ট ছাড়া কাহারো অনিষ্ট চিন্তা তিনি করিতেন না। ভবিষ্যতে জগতের হিতার্থে যিনি সংঘ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে দেহ-মন-প্রাণ যথা সর্বস্ব দান করিয়া কার্য্য করিবেন তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ দেব ভাব বিরাজ করিবে ইহা নিঃসন্দেহ। প্রায়

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাবধি তাঁহার অনেক কার্য্য কলাপ দেখিয়াছি। তিনি ধর্মের কাজগুলি সাধারণতঃ নীরবে বা গোপনেই করিতেন। এত শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি বালকের মত থাকিতেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বা কার্য্যকারিত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন একবারে উদাসীন। কর্তব্য কার্য্যে তিনি সর্বদাই অনলস ছিলেন। জীবনে কোন কার্য্যই তিনি মূলতবী রাখিতেন না। অহোরাত্র খাটিয়া সব কাজ তিনি করিতেন। সদাচার, বিদ্যাবত্তা, ধর্মবল ও দীনতাই তাঁহাকে বরণ্য করিয়াছিল। পরনিন্দা, পরচর্চা তাঁহাকে কখনও করিতে দেখি নাই। তিনি সর্বদাই জগতের হিতের নিমিত্ত পঞ্চেন্দ্রিয় গত কার্য্য করিতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীন ঐক্যে যোগ দিয়া জগত মুক্তির কার্য্য করিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ যখন নবীনগর স্কুলে শিক্ষতার কার্য্য করিতেন তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালালের জন্ম হয়। হীরালালের এক বৎসর না যাইতেই তাহার মাতৃ দেবী হঠাৎ পরলোক গমন করেন। দেশ প্রেমিক হীরালাল শিশুকালে মাতৃ হারা হইল। গুরুদেব শিশু সন্তান হীরালালকে নিয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। তৎপর ঢাকা জেলার হাইরমারা গ্রামে রুহিদাস পাল মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে তিনি দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিধির কি বিধান, এই বিবাহেও তাঁহার সংসারের সুখ শান্তি বেশী দিন

রহিলনা। অল্প কালের মধ্যেই আমাদের দ্বিতীয়া মাতৃদেবী হঠাৎ নশ্বর দেহ ছাড়িয়া নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন।

তৎপর :-

“স্ত্রী ও পুরুষের যোগ সকলের মূল।”

“একাকী সাধনের ইচ্ছা অর্দ্ধ যোগ মাত্র।”

মহাত্মা “প্রকৃত তত্ত্বের” এই দুই তত্ত্বের চিন্তা করিয়াই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দ্বিতীয়া মাতৃদেবীর কনিষ্ঠ ভগিনীকে তৃতীয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সরোজ, মনোজ ও বাসন্তী তৃতীয়া মাতৃদেবীর গর্ভজাত সন্তান। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এই শিশু সন্তানগণের অপরিণত বয়সেই সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তৃতীয়া মাতৃদেবীও হঠাৎ একদিন পরলোক বাসী হইলেন।

উপর্যুপরি এত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ একান্ত মনে চলিতে লাগিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী পুরুষ বলিয়া নীরবে সব শোক সংবরণ করিয়া লইলেন। তখন সর্বদাই বহু লোক বহু ব্যাপারে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। এত বিপর্যয় এবং পারিবারিক দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়াও তিনি অল্লাস বদনে কর্তব্য কার্য করিয়া চলিতে থাকেন। সকলকে লইয়াই হাসিমুখে ধর্মের সকল কার্য করিতেন। সংসারের এত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়াও তিনি সর্বদা উৎফুল্ল মনে সকলকে লইয়া চলিতেন। তাঁহাকে কখনও বিমনা হইয়া থাকিতে দেখি নাই। তখন আমরাও মনে মনে ভাবিতাম, আনন্দময়ের ভিতরে নিরানন্দ বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সংসারের এত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সর্বদাই নিরলস ভাবে কর্তব্য কার্য করিয়া যাইতেন।

গুরুদেব তাঁহার একমাত্র কন্যা বাসন্তীকে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি বাসন্তীকে তাহার শিশু কাল অবধি সর্বদা চোখে চোখে রাখিতেন এবং আদর যত্ন করিতেন। সময় সময় তিনি নিজেই তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। বাসন্তী তাঁহার পরম আদরের কন্যা ছিল। বাসন্তী কলেজে পড়ার কালে স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃই তাহার ক্ষীণ স্বাস্থ্য হইতে থাকে। লীলাময়ের কি অপূর্ব লীলা অবশেষে ১৩৬৯ বাংলা ২রা শ্রাবণ তারিখে বাসন্তী পরমারাধ্য পিতৃদেব এবং সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া যায়। শোকের ঝড় বহিল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিষাদের ছায়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গুরুদেব সহসাই সকল শোক সংবরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার মন প্রশান্ত হইল। বাসন্তীর পূত চরিত্র ও সদগুণাবলীর কথা স্মরণ হইলে আজও আমরা দুঃখ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না।

এত পারিবারিক বিপর্যয় ও প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ শত শত ধর্মার্থী লইয়া সর্বদাই অল্লাস বদনে চলিতেন এবং ধর্মের যাবতীয় কার্য করিয়া যাইতেন। বাহিরে কোন ভাবান্তর আমরা দেখিতে পাই না। ভাবিতাম, কেহই জগতে বিপন্ন, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত না হইয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের যোগ লাভের পূর্বের সাধকের এই অবস্থাই হইয়া থাকে।

হীরা লাল, সরোজ ও মনোজ সকলেই কৃতবিদ্য। তাহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে স-সম্মানে ও স্বাধীন ভাবে গৃহ ধর্ম পালন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্ব ধর্ম মিশনের পূর্ব ইতিহাস

শ্রী আনন্দের জীবদ্দশাতে সর্ব ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার্থে কোন সংঘ ছিল না। তাঁহার পরলোক গমনের পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ, শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজীর সঙ্গে সর্ব ধর্মের প্রচার সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিতেন। শ্রী আনন্দের অমর কাহিনী অনেক সময় শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজী অফুরন্ত ভাষায় কীর্তন করিতেন। আলোচনা কালে স্বামিজীর হৃদয় আনন্দ রসে শত মন্দাকিনীর ন্যায় উছলিয়া উঠিত। ১৩১৫ বাংলা সনের মাঘ মাসে মনোমোহন স্বামিজী ও শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আরও কয়েক জন ভক্ত সহ কাছাড় জেলার অরুণাচলে দয়ানন্দ স্বামিজীর উৎসবে যোগদান করিয়া ফিরিবার পথে ভোলাচং নিবাসী স্বর্গীয় গগন চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করতঃ সর্ব ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক ফন্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই আজ সর্ব ধর্ম মিশন আকার ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে উক্ত পাল মহাশয়ের দানের ভূমিতেই মিশন হেড অফিস স্থাপিত আছে।

এই ফন্ড প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর না যাইতেই দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজী পরলোক গমন করেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বড়ই মর্মান্বিত হইয়া পড়েন। কিছু কাল পর ঐ ফন্ডের অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি কার্যারম্ভ করেন। কিন্তু ইহার ফল আশাপ্রদ হয় নাই। শ্রীমৎ মনোমোহন

স্বামিজী তাঁহার জীবিত কালেই সাতমোড়া আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর এই আশ্রমের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অনেক ধর্ম বন্ধুকে আহবান করিয়া উক্ত আশ্রমে সমবেত হন। শোকের ঝড় ও ধর্মের নূতন বল এই উভয় নিয়াই সকলের মধ্যে ধর্মের ভাব জাগিয়া উঠে। যাতে আশ্রমটি সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর হইতে পারে এবং ধর্মের প্রচার কেন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট হইয়া কার্য করিতে লাগিল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের চেষ্টায় মনোমোহন স্বামিজীর রচিত “মলয়া” বাহির হইল। ইহার প্রচারও খুব আশাতীত রকমের হইল। ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থে আশ্রমের খরচ চলিতে লাগিল। ১৩১৬ বাংলা সন হইতে ১৩২০ সন পর্যন্ত শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সাতমোড়া আশ্রমের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে আশ্রমটির পরিচালনার ভার স্বামিজীর খুড়া ও ভাইদের হাতে সমর্পণ করা হইল। স্বামিজী অন্তর্ধানের পর কোন্ যোগ্য ব্যক্তি এই আশ্রমের আচার্য্য হইয়া প্রচার কার্য চালাইতে পারে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল। অবশেষে শ্রী শ্রী আচার্য্য মহারাজের সুযোগ্য পুত্র ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়কে ইহার মীমাংসার জন্য আহ্বান করা হইল। তাঁহার উপদেশানুসারে শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামিজীর বিধবা পত্নী আসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাঁচ বৎসর না যাইতেই আবার আশ্রমের যাবতীয় পরিচালনার ভার শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের উপরই অর্পিত হইল।

আশ্রমটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে সেই জন্য তিনি বাড়ীর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট লোক লইয়া একটি পরিচালক সমিতি গঠন করেন। তখনও “মলয়ার” বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারাই আশ্রমের খরচ চলিতে লাগিল। সময় সময় অকুলন হইলে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ টাকার ব্যবস্থা করিতেন। সকলেরই লক্ষ্য রহিল আশ্রমটি যাহাতে কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মনোমোহন স্বামিজীর সেই ফন্ডের পুনরুদ্ধারের জন্য এবং প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠার জন্য উজানচরে একটি কারবার আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রী আনন্দ স্বামী মহারাজের নামানুসারে এই কারবারের নাম “আনন্দ ভান্ডার” রাখা হইল। উহার উদ্দেশ্য রহিল- কারবারের আয় সর্ব ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে খরচ হইবে। কর্মচারীগণ লাভের একটা অংশ পাইবেন এবং কিছুটা আয় মূলতবী ও রহিবে। তারপর তিনি দয়াময়ের আদেশ পাইয়া আনন্দ ভান্ডার নামে আর একটি কারবার কলিকাতায় ২৭নং সুফিয়া স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কারবারের সংশ্রবে ফটোগ্রাফী ছিল, আবার ইহাতে পুস্তকও প্রকাশ হইতে লাগিল। অনেক টাকা কড়ি খরচ করিয়া এই কারবারটি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। “ভাবের অভিব্যক্তি” ও ইহার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল। ক্রমেই কলিকাতার আনন্দ ভান্ডারের জন্য বহু অর্থ ক্ষতি হইতে লাগিল এবং উজানচরের আনন্দ ভান্ডারের ও বহু লোকসান হইল। ১৩২২ বাংলা সনের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩২৮ বাংলা সনের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অবশেষে ১৩২৬ বাংলা সনের অগ্রহায়ন মাসের শেষ ভাগে উজানচরের আনন্দ

ভান্ডার ও কলিকাতার কারবার তুলিয়া দেওয়ার মত সাব্যস্ত হইল। কারণ পুঁজিরও অভাব ছিল, পৃষ্ঠপোষকতা করেন এমন লোকও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং আনন্দ ভান্ডার দুইটি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিবার জন্য তিনি তৎপর হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ঢাকা জেলার রায়পুরার নিকট হাসিমপুর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে হইতে ২/৩জন সঙ্গী সহ ২রা পৌষ হাইরমারা গ্রামে তাঁহার ধর্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত রমনীমোহন পাল মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। শেষ রাত্রিতে যখন তিনি সাধনে নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে এক নতুন আলোকোজ্জ্বল রাজ্য ফুটিয়া উঠে। হৃদয়ে তিনি দয়াময়ের আদেশ বাণী শুনিতে পাইলেন- “বাড়ী চলিয়া যাও পরশু যাইয়া সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা কর।” সে দিন শুক্রবার খুব ভোর বেলা, পরশু রবিবার। রবিবারই সর্ব ধর্মাবতার শ্রীশ্রী আনন্দ স্বামী মহারাজের জন্ম দিবস। শ্রীগুরুর জন্ম দিবসে তাঁহার ধর্ম মত প্রচারার্থে সর্ব ধর্ম মিশনের প্রতিষ্ঠা হইবে জানিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। আরও কিছু সময় সাধন ভজন করিয়া তিনি তৎক্ষণাত্ই উজানচর কৃষ্ণনগর চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা

আনন্দাদ-৮৮

১৩২৬ বাংলা / ৫ই পৌষ-রবিবার / ১৯১৯ইং ২১ ডিসেম্বর
রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় সর্ব ধর্ম মিশনের প্রতিষ্ঠার কার্য
প্রকাশিত হইল-তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।
জগতের শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব প্রকারের কার্যভার স্বয়ং
দয়াময় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কার্যের মহিমা গ্রহণ
করিতে পারি নাই বলিয়াই রাজ্য ভ্রষ্ট ভাবে এত কাল নামের
আশ্রয় পরিবর্জন পূর্বক লোকের আশ্রয় খুঁজিয়া ছিলাম। সেই
জন্য বিশুদ্ধ ভাবের প্রণালিকা সাধন ভজনের মধ্যে উপস্থিত হয়
নাই। ধর্ম মন্ডলী গঠন করিবার প্রয়োজন আমাদের মনের কথা
নহে। ইহা আদেশ বাণীতে আমরা জানিয়াছিলাম এবং কি প্রকারে
সেই গঠন কার্য পরিণত হইতে পারে তাঁহারও আভাস প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম, তথাপি দয়াময় নামের সকল ভক্ত এক যোগে কার্য
করিলে পর অশান্তির হেতু থাকিবে না ভাবিয়াই পূর্ণ উদ্যমে
আনন্দ ভান্ডার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেহ কার্য
করিতে গিয়া ইহার মৌলিক সাধনার ভিত্তি অনুভব করেন নাই।
পক্ষান্তরে আনন্দ ভান্ডার সকলের নিকট লাঞ্চিত হইয়াছে।
আমাদের সকল আশা ভরসা আনন্দ ভান্ডারের ভিতর দিয়া ফুটিয়া
উঠিয়াছিল এবং সুপরিচালনার জন্য আমরা এই নামের সকলের

সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
মহাশয়ের সভাপতিত্বে নতুন ভাবের কার্য আমাদের করিতে
হইয়াছিল। জীবের কল্যাণার্থে আনন্দ ভান্ডার প্রকৃত অধিকার
লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা এ মন্ডলীকে বুঝাইয়া উঠিতে পারি
নাই। কাহারও মনে ধারণা হয় নাই যে আমরা সর্বস্বাস্থ্য হইয়াও
নাম প্রতিষ্ঠা কল্পে দয়াময়ের প্রত্যাদেশ জানিয়াই নিযুক্ত হইয়াছি।
এই কারণেই সমবেত ভাবে সর্ব ধর্ম যোগ মন্ডলীর
অবতরণিকা। ইহাতে মনের যোগ শেষ হইতে পারিবে না বলিয়া
আনন্দ ভান্ডার সর্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। তথাপি
আমাদের লাভ ক্ষতি নাই জানিয়া উহাতে অসন্তুষ্ট হই নাই।
বাস্তবিক কথা এই আমাদের প্রয়োজন নাম প্রতিষ্ঠা করিয়া
জগতের সকলকে লইয়া একচ্ছত্র ধর্ম সংঘ নির্মাণ করা। উহাতে
স্বামী স্ত্রী যোগে জীব সকল কার্য করিবে, এক ঈশ্বরের কৃপাতে
নির্ভর করিয়া জীবন পথে আমাদের সকল কার্য করিতে হইবে ও
কাহারো অপেক্ষা না করিয়া দয়াময় নামেতে প্রতিকার লাভ
করিতে হইবে। প্রেম রাজ্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগে জীবের সকল অভাব
মোচন করিবে। এই প্রেম সার্বভৌমিক সম্বন্ধ মূলক হইবে এবং
বিকাশ বিহীন ভাবে জগতের সকলকে পবিত্র করিবে, দেহ
আত্মার প্রভেদ ঘুচিবে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগের মর্ম উদঘাটিত হইবে
এবং সর্বতোভাবে কার্য সিদ্ধি পূর্ণ হইবে। আমরা দেখিয়াছি
সর্ব ধর্ম যোগমন্ডলীর সভ্যগণ সমবেত চেষ্টা এরূপ কোন মহৎ
উদ্দেশ্য মনে করিয়া আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং আজ আমরা
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব ধর্ম

মিশনের সৃষ্টি প্রাতঃকালীন উপাসনাতে লাভ করিয়াছি ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। স্বামী শ্রী যোগে কার্য ইহার মূলতত্ত্ব এবং সার্বজনীন, কার্য প্রণালী ইহার বিশেষত্ব। দয়াময় নামের সাধনা উহার মূলমন্ত্র এবং সর্ব ধর্মের ঐক্যে যোগ দিয়া লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম পথ প্রদর্শন করা উহার অস্ত্র। সুতরাং স্বামী শ্রী সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া যতই কার্য করিবে ততই সর্ব ধর্ম মিশনের অধিকার জগতে বিস্তৃত হইবে। আমরা উহার অনুসরণকারী মাত্র। যেহেতু দয়াময় এই মিশনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তিনটি পথে সর্ব ধর্ম মিশনের কার্যকারীগণ কার্য করিবেন। যাহার যে পথ জীবন মুক্তির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি সে পথেই গমন করিবেন। কখন কোন পথ প্রয়োজনীয় তাহা ঈশ্বর বাণী দ্বারা জানিয়া লইতে হইবে এবং কার্যের ভিত্তি নিরূপিত হইবে। আমিত্বের যোজনা হেতু আমরা ঈশ্বর হইতে পৃথক এরূপ ধারণা করিয়া থাকি, কিন্তু যখন আমরা সর্ব সংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক এক ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হই তখনই আমাদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়। অতএব সর্ব ধর্ম মিশন আমিত্ব বর্জিত হইয়া কার্য করিবেন। এমন নহে, ইহার কার্য দ্বারা জীবন মুক্তির আদর্শ গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নামের প্রচার সর্ব শেষে মিশনের একমাত্র কার্য হইবে। এজন্য মিশনকে দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি বিবেচনা করিতে পারি।

আমরা আজ থেকে ঈশ্বরকে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিব। অন্য কোন প্রতিকারের প্রতি লক্ষ্য করিব না নামেতেই ঈশ্বর বিদ্যমান জানিয়া তাহাতেই নির্ভর করিব, এবং দয়াময়ের কৃপাতে জীবনমুক্ত হইতে পারি সে জন্য সাধন ভজনে অবহেলা করিব না। যে নিয়ম যেভাবে প্রকাশিত হইবে, সেই নিয়ম সেই ভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে সে চেষ্টারও ক্রটি হইবে না। আমাদের কার্যে যে সকল দোষ আছে তাহা কেহ প্রদর্শন করিলে আনন্দের সহিত সংশোধনে ব্রতী হইব। সুতরাং একটি নিয়ম সার্বজনীনভাবে নিম্নে দয়াময়ের আদেশ মতে লিপিবদ্ধ হইলঃ- কালী কৃষ্ণ শিব যোগে এই সর্ব ধর্ম মিশনের জীবন পূর্ণ প্রস্তুতি হইয়াছে। আনন্দ ভান্ডার সার্বজনীন ভাবে নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহাতে সার্বজনীন উপাসনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষয়ের ভিত্তি চিরদিনের জন্য জগতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং বিষয় লীলার যোগ শেষ করিয়া সদয় নিদয় উভয় ভাবে দয়াময় অবিষয় লীলার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। আনন্দ ভান্ডার বিষয় যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল। সর্ব ধর্ম মিশন অবিষয় যোগে প্রকাশিত হইয়াছে। অবিষয় ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে অবিষয় প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। উহার মধ্যে সিদ্ধযোগের কার্য পূর্ণভাবে উপস্থিত হইয়া সর্ব ধর্মের পূর্ণ যোগ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই মিশনকে জগতের জীবন বলিতে পারি কারণ ইহার ফলে সংসার ও স্বর্গ সকলের পক্ষে অনুকূলে হইবে। এই পৃথিবীতে আর রোগ, শোক ও মৃত্যুর অধিকার থাকিবে না।

আজ তিনভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্ব সমেত ২৫টি লোক লইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন গঠিত। তন্মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীতে ছয়জনের অতিরিক্ত মানুষ নাই মনে করিবে, বাকী ১৯ জন বিশেষভাবে পরলোক হইতে কার্য্য করিবেন।

তাহাদের নাম :-

- ১। শ্রীমদ্ আচার্য্য আনন্দ স্বামী
- ২। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস
- ৩। যীশুখৃষ্ট
- ৪। মুহাম্মদ
- ৫। চৈতন্য
- ৬। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
- ৭। দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী
- ৮। শঙ্করাচার্য্য
- ৯। বায়েজিদ বোস্তামী
- ১০। কবি গুরু বাঙ্কীকি
- ১১। শ্রীশ্রী জয় দুর্গা
- ১২। কালী
- ১৩। কৃষ্ণ
- ১৪। শিব
- ১৫। মহা মহাকালী
- ১৬। রাধা
- ১৭। রাম
- ১৮। বুদ্ধ

- ১৯। মনোমোহন
- ২০। শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দত্ত
- ২১। লব চন্দ্র
- ২২। নিশি
- ২৩। কুমুদ
- ২৪। রসিক
- ২৫। হরিমোহন আচার্য্য

এই সকল মিশনের কার্য্যকারী সমবেতভাবে সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকেন। মূলে কোন প্রকার অনৈক্য ইহাদের কার্য্যে বিদ্যমান নাই। তবে অদ্যাপি সাক্ষাৎ ভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার সময় আসে নাই। আগামী ৩য় বর্ষের পর প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এই সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন আমাদের ইচ্ছাতে গঠিত হইতেছে না। যিনি সর্ব্ব শক্তিমান তিনিই এই কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। আজ থেকে আমরা দয়াময়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। এই মিশনে আমাদের সর্ব্ব জগতের অধিকার আসিয়াছে। পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ হইলে জগতের লোক এই মিশনে যোগদান করিবে। তখন দেহধারী মানব পরলোক হইতে প্রকাশিত হইবে' সে দিনে আমাদের দুর্দিন ঘুচিবে। আমরা দেখিতেছি দেড় বৎসর গেলে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাধন ভজন

আমরা সম্প্রতি সাতমোড়া আনন্দ আশ্রমকে সাধন ভজনের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিব। সেখানে সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রচারার্থে মা ও আমি নিয়োজিত থাকিব। প্রয়োজন পড়িলেই নামের লোকদিগকে

সংবাদ দিয়া নেওয়া হইবে। সেখানে সাধন ভজন কার্যে তাহাদের যোগ দিতে হইবে। পূর্ণভাব সেখানে বিদ্যমান আছে মনে করিবে। জগতের যোগে যখন যে স্থানে কার্য করা আবশ্যিক সে স্থানকে আমাদের মান্য করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া কার্য করেন, আমরা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে যন্ত্রবৎ চালিত হইতে থাকি।

হিতানুষ্ঠান

সময় সময় এখন হইতে সর্ব ধর্ম মিশনের কার্যকারীগণ পরোপকার ব্রতের বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিশন জগতের ভার লইয়াছেন। এই জন্য সৎ কর্ম করা শ্রেয়ঙ্কর মনে করিবে। যদি আবশ্যিক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা কোন স্থানে আশ্রম, কোন স্থানে বিদ্যালয়, কোন স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন, কোন স্থানে পুকুর খননাদি পুর্নকার্য করিব। এই সকল কার্যের বিশেষ ব্যবস্থা রসিক ও ভক্ত মিলিয়া করিবে কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সকলের শেষে আমাদের নিকট জানিতে হইবে।

কার্য বিভাগ

আমাদের সদ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকার কার্য করিতে হইবে। তন্মধ্যে রোগীর সেবা ও বিপন্নের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষ কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহা ছাড়া জগতের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প সকল কার্যেরই প্রয়োজন আছে। ইহার সাধন লাগিবে না। ইহা উর্দ্ধতন জগত হইতে নিয়মিত হইবে।

আর্থিক সমস্যা

জগতের কল্যাণ কামনা করিয়াই আমরা কার্যের আয়োজন করিয়াছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে সকল আশা ভরসার অবসান হইয়াছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারি আমাদের হৃদয়ে এখনও ধর্ম বীজ, (ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চিনাসীৎ তদিদং সর্বমসৃজৎ ত্বদেব সর্বশক্তি মৎ) বিকশিত হয় নাই। যদি হইত তবে আমরা অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতাম না। অতএব সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠার বিলম্ব ঘটিয়াছে। আর্থিক সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়াই আমরা এতকাল অন্যের সহায়তা মাগিয়াছিলাম। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব প্রতিকার নামের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারই ইচ্ছাতে ও নামের মহিমাতে আমাদের নিকট আজ সর্ব ধর্ম মিশন প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি উপায়ে আমরা অর্থ সংগ্রহ করিব। প্রথম কথা এই যাহা আবশ্যিক ভগবান দয়াময় নিজেই আনিয়া উপস্থিত করিবেন এবং অস্বাচিত ভাবে উহা গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই আমাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল সময় সময় তাহাদের নিকটে আদেশ পাইলে প্রার্থনা জানাইব। যাহারা এই আদেশ বা প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে তাহারা অবশ্য অচিরকাল মধ্যে সংসারের অকুশল দর্শন করিবে। এইভাবে টাকা সংগ্রহের মধ্যে কোন দোষ নাই ইহা তাঁহারই ইচ্ছা ও বিধি। মধ্যে মধ্যে কার্যকারীদিগের সম্পত্তি কিংবা অর্থ মিশনে দান করিতে হইবে। ভাবিবার বিষয় আর কিছু নাই। দয়াময় স্বয়ং প্রকাশিত ভাবে কার্য করিবেন। নাম লইতে লোক আসিলে কিংবা

ভক্তভাবে কার্য্য করিতে চাহিলে অথবা যাহারা নামের লোক আছেন তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইতে হইবে। নিদিষ্ট হার দয়াময় বলিয়া দিবেন। উজানচর আনন্দ ভান্ডার ও কলিকাতার আনন্দ ভান্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় কারবারের যথেষ্ট ঋণ আছে। আর্থিক কষ্টের এক শেষ হইতেছি। অতএব কার্য্যের সুবিধার জন্য কাহারো নিকট হইতে ধার করা আবশ্যিক মনে হইতেছে। ভান্ডারের সম্পত্তি আবদ্ধ করিয়াও ধার করা অসঙ্গত নহে; এবং যাহাদের নিকট পূর্ব বর্ষের চাঁদা বাকী আছে তাহা আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাদের নিকট ঋণ আছে তাহাদের নিকট দুই বৎসর তিন মাসের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে-ইহার মধ্যে পরিশোধ করা সম্পূর্ণ সত্য জানা যাইতেছে। যাহাদের ভান্ডারে দেনা আছে তাহাদের সহিত অবস্থানুসারে মীমাংসা করিতে হইবে। সকল কার্য্যের মীমাংসা এই মাসের ২৩শে তারিখের মধ্যে করিতে হইবে। চাঁদার লিষ্ট দান সংগ্রহের লিষ্ট সাতমোড়া আশ্রমে বসিয়া করিবে। উজানচর আনন্দ ভান্ডারের মধ্যে যে কয়েকটি কারবার আছে তাহাদের কোনটিকেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। সিদ্ধ যোগের ব্যাপার ইহার মধ্যে নিয়মিত হইতেছে। সুপারিন্টেনডেন্ট রূপে ভক্ত কার্য্য করিবে। সহকারী হিসাবে রসিক চলিবে।

আশ্রম

যেখানে যে আশ্রম থাকিবে সকল স্থান হইতেই কার্য্য বিবরণী তিন মাসে একবার উজানচর মিশন মন্দিরে পাঠাইতে হইবে। সুপারিন্টেনডেন্ট আশ্রমগুলির ত্রৈমাসিক হিসাবে কার্য্যকারীদিগের

নিকট হইতে লইবেন। আশ্রমের ভার যাহার উপর থাকিবে তাঁহাকে আমরা গুরু বলিব, স্ত্রীলোক হইলে তাঁহাকে আমরা সকলে ‘মা’ বলিয়া ডাকিব, গুরু স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না, মিশনের অধীনে তাহার কার্য্য করিতে হইবে। সর্ব্বদা ঈশ্বর হইতে আদেশ জানিয়া তাহা আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতিতে জানাইবেন। একমত হইলে কার্য্য করিবে নতুবা অপেক্ষা করিতে হইবে। বিশেষ হুকুম হইলে উহা প্রেসিডেন্ট বরাবর পেশ করিতে হইবে। মূল কথা সমবেত ভাবে কার্য্য করা আবশ্যিক। গুরু বলিয়া আশ্রমের সকল ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে সমিতি বা মিশনের পরামর্শ আবশ্যিক হইবে। টাকা পয়সা আশ্রমেই থাকিবে। প্রয়োজনে মিশনের কার্য্যের জন্য প্রেসিডেন্ট আশ্রম হইতে টাকা লইতে পারিবেন। সকল আশ্রমই মিশনের অবয়ব মাত্র।

পরিদর্শন প্রণালী

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের কর্তৃপক্ষগণ যে কোন আশ্রম যে কোন সময় পরিদর্শন করিতে পারিবেন। শৃঙ্খলা বিধানই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য, সুতরাং কার্য্যকারীদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া দোষগুণ আলোচনার পর ব্যবস্থা বিহিত হইবে। পরিদর্শন কালে আশ্রমের সকল তত্ত্ব সংগৃহীত হইবে। এক কপি প্রেসিডেন্ট বরাবরে পাঠাইতে হইবে। উপাসনাদির প্রয়োজন নাই। আবশ্যিক বিবেচিত হইলে আদেশ জানান হইবে। যজ্ঞাদিও আদেশ অনুযায়ী হইবে। আশ্রমে সদানুষ্ঠান সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় উহাদের

ভিতর দিয়াই দীন-দরিদ্রের সহায়তা করা হইবে। আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা বিদ্যালয় স্থাপনাদি কার্যেও আশ্রমাদি পথ প্রদর্শক হইবে। আশ্রমের অর্থে কার্য সম্পাদন দৃষ্টির হইলে মিশন সাহায্য করিবে। বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার মিশন গ্রহণ করিবে। আশ্রমে কেহ কোন সময় অবান্তর আলোচনা করিতে পারিবেনা। প্রত্যহ আরতি করিবে। উপাসনার ব্যবস্থা গুরুজী করিবেন। সাধন ভজন আশ্রমের প্রধান কার্য হইবে। গ্রন্থ পাঠ আনুসঙ্গিক কর্ম হইবে। সময় বিশেষে উৎসব প্রয়োজন হইবে। উহা জগতের যোগে প্রকাশিত হইলেই সিদ্ধ বিবেচিত হইবে। প্রত্যেক আশ্রম বৎসরে একটি উৎসব করিবে।

উজানচর আনন্দ ভান্ডারই সর্ব ধর্ম মিশনের প্রকৃত উদ্বোধন। ইহার কার্যকারীগণের সাংসারিক বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যিক। নতুবা ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা থাকিবেনা। আবশ্যিক মনে করিলে আদেশ মত আমরা সহায়তা করিতে পারিব।

১৩২৬ বাংলা ৫ই পৌষ

১৯১৯ইং ২১ ডিসেম্বর রবিবার

শ্রী লব চন্দ্র পাল

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ৫ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় বসিলে মিশন প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কার্য তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল। যথাবিধি প্রতিষ্ঠার কার্য উদ্ধার হইল। উপাসনার পর সর্ব ধর্ম মিশন সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম প্রণালী তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। মিশন মন্দিরে বসিয়াই তিনি সব লিখিয়া লইলেন। সর্ব

ধর্ম মিশনের ইতিহাস এখান হইতে আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে।

কিন্তু কর্তা মহারাজের মন স্থির হয় নাই। কারণ উজানচর আনন্দ ভান্ডার এবং কলিকাতা আনন্দ ভান্ডার বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কারবার দুইটি উঠাইয়া লইতে মনস্থ করিলেন। বহু টাকা ধার করিয়া কারবার দুইটির পুঁজি দেওয়া হয়। কারবার দুইটির লোকসান হওয়ার তিনি সত্তর হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এত টাকা ঋণ কিভাবে আদায় করা যাইতে পারে এসব চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। সব বেচা বিক্রী করিয়া ঋণ শোধ করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। অবশেষে ২৫শে পৌষ রবিবার উজানচর বাজারের আনন্দ ভান্ডার গৃহে শেষ কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কতিপয় ধর্ম বন্ধুদের লইয়া এক সভা আহ্বান করেন। সভার পূর্ব দিনে তিনি শুনিতে পাইলেন, দয়াময় বলিতেছেন- “৪০ জন হইতে ধার লইয়া কার্য আরম্ভ কর-ইহাই শেষ সমাচার।” দয়াময়ের এই আদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি পরদিন হইতেই ঋণ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধীরে ধীরে সব নিয়ম পত্র বাহির হইল-ঋণও সংগ্রহ হইতে লাগিল।

এদিকে সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। অপর দিকে সাতমোড়া আশ্রম গঠনের জন্য দয়াময়ের আদেশ পাইয়া ১৩২৬ বাংলা সনের ফাল্গুনের তৃতীয় দিবসে তিনি সেখানে যাইয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন। সেখানে ধীরে ধীরে কিছুলোক মিশনে ভর্তি হইল। দয়াময়ের আদেশ লইয়া জন প্রতি মাসে ০.৫০ টাকা চাঁদা ধার্য করা হইল। এতে যে টাকা পাওয়া যাইত তাতে

মিশনের খরচ নির্বাহ হইত না। ধার কর্ত্ত করিয়াই মিশনের খরচ চলিতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার আনন্দ ভান্ডার, উজানচর বাজারের কারবার এবং সাতমোড়া আশ্রমের বহু খরচ আছে। এ ছাড়া আরও কত রকমের খরচ আছে। এসব খরচ চালাইতে তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। এত ব্যয় ভার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। এ সময় ভোলাচং নিবাসী গগন চন্দ্র পাল নামে একজন নিঃসন্তান ধর্ম বন্ধু তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ট্রাস্ট দলিল করিয়া মিশনে দান করিলেন। এই গগন চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতেই সর্ব্ব ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার্থে মনোমোহন স্বামিজী সহ সর্ব্ব প্রথম একটি ফন্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরই মঙ্গলময় ভগবান সত্যই সুদিন আসিতেছে শ্রীশ্রী কর্ত্তা মহারাজের অন্তরে এই আভাষ দিতে লাগিলেন। ইহা ১৩২৮ বাংলা সনের আষাঢ় মাসের কথা। ইতিমধ্যে ৩রা ভাদ্র শনিবার প্রাতের উপাসনাতে সাতমোড়া আনন্দ আশ্রমে মিশনের মেম্বারদের জন্য নিম্ন লিখিত প্রত্যাদেশ (বাণী) বাহির হইল।

- (১) ঈশ্বর অন্বেষণ করিবে।
- (২) মিশন সেবা করিবে।
- (৩) আদেশ মত কার্য্য করিবে।
- (৪) প্রত্যেক মাসে ০.৫০ টাকা চাঁদা দিবে, ইহা বৈশাখ, ভাদ্র ও পৌষ এই তিন কিস্তিতে ২.০০ টাকা হিসাবে আদায় করিবে।

মিশন প্রতিষ্ঠার দিনেও শ্রীশ্রী কর্ত্তা মহারাজ নিম্নোক্ত তিনটি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

- (১) সর্ব্বদা দয়াময় নাম স্মরণ করিবে।
- (২) সস্ত্রীক সাধন করিবে।
- (৩) সত্য ভিন্ন মিথ্যা আচরণ করিবে না।

সুতরাং উক্ত ৭টি নিয়মের উপরই মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৩২৮ বাংলা ভাদ্র মাসে যে চারটি নিয়ম আবির্ভূত হয় তাহাও পত্র লিখিয়া সমস্ত মিশন সভ্যকে তিনি জানাইয়া ছিলেন। উহার ফলে প্রায় দেড়শত লোক মিশনে ভর্তি হইলেন। তখন হইতেই মিশনের আয়ের সুন্দর পথ পাওয়া গেল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে তিনি কলিকাতায় গেলে আরও তিনটি নিয়ম প্রকাশিত হইল।

- (১) চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সংসার চালাও।
- (২) দান সংগ্রহ করিয়া ঋণ শোধ কর।
- (৩) ধার কর্ত্ত করিয়া কারবার চালাও।

এই আদেশ পাইয়াও তিনি মিশনের শৃঙ্খলা তেমন করিতে পারেন নাই। সাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মিশনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে ইহা তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন।

রেজিষ্ট্রেশন

১৩২৯ বাংলা সনের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রী কর্ত্তা মহারাজ যখন কলিকাতায় ২৭নং সুফিয়া স্ট্রীটে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন একদিন তাঁহার এক ধর্মপ্রাণ বন্ধু, বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র রায় (বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন এবং

মিশন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। ২/১ দিন পর উক্ত বৈষ্ণব উক্ত মিশনে ভর্তি হইবেন জানাইয়া তাঁহার নিকট ৪টাকা পাঠাইয়া দেন। বাহিরের লোক মিশনে ভর্তি হইতে পারে না ইহাই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ জানতেন। তিনি অপেক্ষা করিতে থাকেন। তারপর একদিন তিনি দয়াময়ের আদেশ বানী শুনিতে পাইলেন- “সর্ব ধর্ম মিশন রেজিষ্ট্রী করা প্রয়োজন তবে মেম্বার মিশনে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে”। অর্থাৎ মিশন সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেই প্রথম শ্রেণীর মেম্বার হইতে পারিবে। দয়াময় নামের লোকই দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য হইতে পারিবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেই অন্য যে কেহ তৃতীয় শ্রেণীর মেম্বার হইতে পারিবে। দয়াময়ের এই আদেশ পাইয়া শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র রায় মহাশয়কে তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন।

কলিকাতায় অবস্থান কালে সুযোগ্য এটর্নি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বিশেষভাবে পরিচিত হন। উক্ত এটর্নি মহাশয় মিশনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন আইনতঃ মিশনের রেজিষ্ট্রেশন আবশ্যিক নতুবা সকলের সহানুভূতি পাওয়া সহজ হইবে না। দয়াময়ের প্রত্যাদেশ ও যতীন্দ্র বাবুর পরামর্শ পাইয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মিশন রেজিষ্ট্রেশন করিয়া লইবেন স্থির করিলেন।

৫ই পৌষ মিশনের বার্ষিক উৎসবে উজানচর বাজারে মিশনের মেম্বারদিগকে লইয়া এক সভার আয়োজন করা হইল। এই সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে মিশন রেজিষ্ট্রী করা ধার্য হইয়া গেল। প্রতি

কেন্দ্র হইতে যথারীতি মিশনের পরিচালক সমিতির জন্য সভ্য নির্বাচিত হইল। তারপর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মাঘ মাসে কলিকাতায় যাইয়া মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মপত্র এটর্নি যতীন বাবুকে দেখাইয়া ২রা চৈত্র শুক্রবার (১৬ মার্চ ১৯২৩ইং) মিশনের রেজিষ্ট্রী কার্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। তিনি বলিতেন এই মিশন সেবা ধর্মের একান্ত নিষ্ঠা ভিন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বরই এই মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিই ইহার পরিচালনা করিতেছেন। মনের সম্যক নিবৃত্তি মিশন সেবাতে প্রাপ্ত হইবে, শান্তির সাধনাতে এই মিশন সর্বতোভাবে কার্যকর হইবে।

সারলক্ষ্য

সর্ব ধর্ম মিশনের স্মারক লিপিতে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-এই মিশন সাধারণের সম্পত্তি নহে-কোন মেম্বারই ইহাকে নিজের ভোগ দখলের সম্পত্তি করিতে পারিবে না। মিশন সর্বদাই ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সকল ধর্মের ঐক্যে যোগ দিয়া জগতকে প্রকৃত ধর্ম পথ প্রদর্শন করিবে। ধর্মের জন্য যাহাদের জীবন মন অর্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই মিশন সাধ্যমত সাহায্য করিবে ও জনহিতকর কার্যের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিবে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশের জন্য মিশনের মধ্যে আন্দোলন চির জাগরুক থাকিবে। সেই ধর্মের মধ্যে সার্বজনীন আদর্শ কার্য করিবে-সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ইহার অঙ্গীভূত হইবে জীবের কল্যাণ কল্লে ভক্তের সেবা করিতে মিশন দ্বিধাবোধ করিবে না। সুতরাং এক সত্যের মহিমাই মিশন পূজা করিবে। মিশনের

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই সত্য বিরাজমান রহিবে। বিশুদ্ধ ধর্ম চক্র প্রবর্তন করিতেই মিশন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শ শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজের প্রকৃত তত্ত্ব গ্রন্থে আছে-যোগ প্রণালীতে আছে। এই জন্য মিশনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থই সার জানিবে। আর যে সর্ব ধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীর উল্লেখ পূর্বে পুনঃ পুনঃ করিয়াছি তাহার উপদেশ মানিয়াও এই মিশন সর্বতোভাবে কার্য্য করিবে। অর্থাৎ জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব ধর্ম ‘দয়াময়’ নামই সর্ব ধর্ম মিশনের কার্য্য পথ করিয়া লইবে ও মিশনের কার্য্যকারীদিগকে শান্তির সুসমাচার প্রচার করিতে সাধনে ব্রতী করিবে। মিশন সম্যক সিদ্ধির পথে পৌঁছিলে দেখিবে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ লাভের জন্যই মেধারগণ কার্য্য করিবেন ও মিশনকে জগতের আদর্শে গড়িয়া নিতেই সমবেত চেষ্টায় সকলে সাধন পথ অব্বেষণ করিবেন।

উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের উক্তিই নিম্নে প্রদত্ত হইল :-
দশের কাজে যন্ত্রণা বেশি। আরও মিশনের ইতিহাস আছে। উহাদের কর্ম কর্তারাও সংগ্রাম করিয়াই গন্তব্যে পৌঁছিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সাধনের সঙ্গে সংগ্রাম চিরমিত্রতা করিয়া রহিয়াছে। আমরা যেমন আদর্শের প্রতি অবিরত বিদ্রোহ-বিপত্তি সমাকুল রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি; সহস্র সহস্র মহাপুরুষ এই প্রকারেই তাঁহাদেরও ধর্ম সংঘ গঠন করিয়াছিলেন। স্বার্থ শূন্য প্রেরণা ভিন্ন কাহারো অন্তরে শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। কেহই অভাবের উগ্রতাড়না

ভিন্ন পথ প্রাপ্ত হয় নাই ও লাঞ্ছিত নিপীড়িত বা বিপন্ন না হইয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিতে পারে না। সাধক এই জন্যই দেখেন জগতের কর্ম করিলে কিংবা ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহিলে অসীম ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। সর্ব ধর্ম মিশনের মধ্যে সর্বদা অভাবেই কার্য্য করিয়াছে। সাধন সুদূর পরাহত বলিয়া অনুভূত হইয়াছে-আর মুহূর্মুহু কেবল নৈরাশ্যের সংগ্রামে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমরা কিছুই করি নাই-যিনি মিশন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনিই সর্বদা সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা সমুদ্র লংঘনে সাহসী হইয়াছি, তিনিই আমাদের পথ করিবেন। জগত মুক্ত করিতে যিনি সংকল্প করিয়াছেন তিনিই তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন।

আজ রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে লেখা মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়ম প্রণালীর দুই চারটি কথা উল্লেখ করিব, যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার উপস্থিত না হয় ও সকলের মধ্যে মিশনের উন্নত আদর্শ বজায় থাকে তাহার নিমিত্তই আইন কানুন ও রেজিস্ট্রেশন। এই মিশন সর্ব ধর্মের ভিতর দিয়া সার্বজনীন ধর্ম চক্র প্রতিষ্ঠা করিবে। সর্ব ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

ধর্ম ধর্ম সজাব জন্মিতে পারে এই মিশন তজ্জন্য নিরন্তর কার্য্য করিবে। শিক্ষার বিস্তার, শাস্ত্রের প্রচার, দীন দরিদ্রের সেবা; সাধন প্রতিষ্ঠা ও লোক হিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়াই মিশন পরিচালিত হইবে। ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের উপকার

হইতে পারে এজন্য স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা হইবে-সদৃশত্বের প্রচার হইবে সর্ব প্রকারে জগতের কল্যাণ কল্পে মিশন কার্য করিবে। মিশনের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে বা আয়ের পথ বাহির হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা যাইবে। সর্বদা শৃঙ্খলা ও শান্তির সহিত চলিতে পরে মিশন সে দিকে সর্বতোভাবে দৃষ্টি রাখিয়া বিত্ত ও অর্থের ব্যবস্থা করিবে। চাঁদা ও দান সংগ্রহ করিবে। দরকার পরিলে ধার কর্জ ও করিবে। মূল কথা এই যে ধার কর্জ করিয়াই হউক বা নিজের আয়ের দ্বারাই হউক মিশন সত্যের প্রতিষ্ঠা সর্ব প্রকারে করিতে পারিবে সত্যের আদর্শে জগতের কল্যাণ করিতে পারিবে।

মিশন পরিচালনার জন্য একটি সভা থাকিবে। ইহাকে মিশন সমিতি বা মিশন কাউন্সিল বলা হইবে। এই সভাতে ত্রিশজন সদস্য থাকিবেন। ইহাই মিশনের শাসন পরিষদ (The Governing Body)। বিশুদ্ধ প্রণালী এবং শৃঙ্খলা মিশনে প্রতি নিয়ত বিদ্যমান থাকে এই উদ্দেশ্যই মিশনের রেজিস্ট্রেশন ও এই পরিচালক সমিতির সংগঠন। বাস্তবিক সকল মেম্বারই মিশনের পরিচালনার আসল কর্তা-তাহাদের সমবেত শক্তিই প্রয়োজন পড়িলে ইহার পরিবর্তন করিতে পারেন, ইহাকে ভাঙিতেও পারেন এতদতিরিক্ত মীমাংসা রাজ শক্তির থাকিবে, সরকারী ধর্ম্মাধীকরণের রহিবে। এই বিত্ত অর্থ মেম্বার, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বাটোয়ারা করিয়া নিতে পারিবেন না। মিশন উঠিয়া গেলেও ইহার টাকা কড়ি বা সম্পত্তি অন্য কোন মিশন বা

প্রতিষ্ঠানে ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ সকলের কল্যাণ কল্পেই এই মিশন সর্ব প্রকারের কার্য করিতে পারিবে-ইহাই প্রকৃত কথা।

আইন কানুন

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং হিসাবরক্ষক এই পাঁচজন সভ্য লইয়া মিশনের কার্যকরী সমিতি (The Executive Committee) গঠিত হইবে। তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলে এই সভার অধিবেশনের কার্য চলিতে পারিবে। প্রেসিডেন্ট মিশনের কার্য নির্বাহক কর্মচারী। মিশনের বিধিমত মিশনের কার্য চালাইবেন। অস্থায়ীভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন। চেক, ছাড়ি, দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্রে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করিবেন। তিনি লিখিয়া ক্ষমতা দিলে অন্যেও এইরূপ দস্তখত করিতে পারিবে।

সর্ব ধর্ম্ম মিশনের প্রধান কর্ম কর্তা ও

তহবিলের কার্য বিভাগ

মিশনের পরিচালক সমিতির (Governing Body) মেম্বার হইতে একজন প্রেসিডেন্ট হইবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রধান সেক্রেটারী (Chief Secretary), তৃতীয় ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) ৪র্থ ব্যক্তি মিশনের আর্থিক ব্যাপার লইয়া কার্য করিবেন (Special Secretary) হইবেন। ৫ম ব্যক্তি মিশনের সংসার বিভাগ নিয়া থাকিবেন (State Secretary)।

তহবিলের ১৮টি বিভাগ থাকিবে

১) সর্ব ধর্ম মিশন ফন্ড ২) সর্ব ধর্ম রিলিফ ফন্ড ৩) পুস্তক বিভাগ ৪) প্রচার বিভাগ ৫) সমাজ বিভাগ ৬) আশ্রম বিভাগ ৭) শ্রম বিভাগ ৮) শিক্ষা বিভাগ ৯) সর্ব ধর্ম তত্ত্ব বিভাগ ১০) আইন কানুন বিভাগ ১১) প্রচারক ও আচার্যের বৃত্তি বিভাগ ১২) কর্মচারী বিভাগ ১৩) রাজলক্ষী ব্যাঙ্ক ১৪) হিসাব নিকাশ বিভাগ ১৫) পেন্সন বিভাগ ১৬) গবেষণা বিভাগ (Research) ১৭) অনুবাদ বিভাগ ১৮) পরিদর্শন বিভাগ।

তহবিল বিভাগ

মিশনে সাধারণ ফন্ড, রিজার্ভ ফন্ড ও মিশন উৎসব ফন্ড এই তিনটি তহবিল সিদ্ধ যোগে প্রতিষ্ঠিত হইল। দানাদি প্রাপ্ত অর্থে রিজার্ভ ফন্ড, ফি ইত্যাদি সাধারণ ফন্ডে এবং উৎসবার্থে প্রাপ্ত অর্থাদি উৎসব ফন্ডে জমা করিতে হইবে। ষোল আনা তহবিল-মিশন ফন্ড তহবিল সাধনার হিসাবে কার্য্য করিবে।

সর্ব ধর্ম মিশন ফন্ডই সর্ব ধর্ম মিশনের মূল বিভাগ মনে করিবে। সর্ব ধর্ম মিশন রিলিফ ফন্ড মিশনের জমির আয়, মানত ইত্যাদি রাখিবে।

যে দিন যে টাকা আয় হইবে ইহার পঞ্চমাংশ মূলতবী রাখিবে। ঐ টাকা রিজার্ভ ফন্ডে জমা হইবে। বাকী টাকা দ্বারা মিশনের ব্যয় নির্বাহ করিবে।

বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক কার্য্য হইতে যা কিছু সংগ্রহ-তাহাই সমাজ ফন্ডে জমা করিবে।

আইন বিভাগ

মিশনের আইন কানুন যখন যাহা প্রয়োজন তাহাই- প্রণয়ণ, রদ, বদল করিতে পারিবে।

শিক্ষা বিভাগ

ধর্ম মূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠার্থে এই বিভাগ কার্য্য করিবে। সকল ধর্মের ঐক্য সম্পাদনই শিক্ষামূলক ব্যাপার, এই জন্যই স্কুল কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রম বিভাগ

কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া মিশনের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

গ্রন্থ বিভাগ

মিশনের আয় বৃদ্ধির জন্য ও প্রচার প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থ বিভাগের কার্য্য আরম্ভ করিবে। পুস্তক ছাপাইবে ও বেচা বিক্রির ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

সাধন বিভাগ

মিশনের সেবকদিগের জীবন ধর্ম জীবনে পরিণত হয়, তাহাদের জীবনের কার্য্যকলাপ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে করা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মিশনের সভ্য দিবারাত্রি সাধন করিবে। ইহাতেই মিশনের সাধন বিভাগ গঠিত হইবে। ইহাই সর্ব সমাজ বিভাগ।

প্রচার বিভাগ

প্রকৃত তত্ত্ব, সর্ব ধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী, যোগ প্রণালী এই সকল গ্রন্থের সত্য সকল যাতে নির্দোষ ভাবে প্রচার হয় তাহার নামই প্রচার বিভাগ। প্রচারক আচার্য্যগণ এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিবেন।

কর্মচারী বিভাগ

নাম নিয়া সাধন করিতে ব্যস্ত এবং সংসারে শৃঙ্খলা বিধানে যেমন নিজের চেষ্টা উদ্যোগ, মিশনের উন্নতি বিধান করিতে তেমন ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা রহিয়াছে এরূপ মানুষ স্ত্রী বা পুরুষ মিশনের কর্মচারী হইতে পারে।

আশ্রম বিভাগ

আশ্রমগুলি মিশনেরই অবয়ব। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জাগরণ আসিবে আশ্রমগুলির কার্যের মাধ্যমে।

সমাজ বিভাগ

যে সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ আদর্শ স্ত্রী বা পতি পাইবার জন্য সাধন করিবে সেই সমাজের নামই সর্ব সমাজ হইবে। ইহাই বীরাচার।

রাজলক্ষী ব্যাংক

মিশনের উদ্দেশ্য নিয়াই মিশনের লোক নিয়া রাজলক্ষী ব্যাংক গঠন করিবে। ইহার অর্থেই আরও নতুন প্রচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। ব্যাংকটি গড়িয়া লওয়াই মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হেড অফিস কৃষ্ণনগর আশ্রম

শ্রী আনন্দ বলিতেন চর মুন্সিকেই সর্ব প্রথম সর্ব ধর্মে প্রচার কার্য বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইবে। এ খবর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজই কথা প্রসঙ্গে কয়েক দিন আমাদিগকে বলিয়াছেন। বাস্তবিক সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ উজানচর বাজারে আনন্দ ভান্ডারের মধ্যে মিশনের হেড অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব সম্মতি ক্রমে তিনিই মিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন এবং আজীবন তিনিই মিশনের প্রেসিডেন্ট থাকিবেন এ প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হইয়াছে। বাবু ইন্দ্র কুমার দত্ত এম, এ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। বাবু কুমুদ বন্ধু দে (ভক্ত বাবু) মিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নিয়মিত ভাবে হেড অফিসেই মিশনের কার্য করিতে লাগিলেন। সময় সময় কর্মচারী সমিতির অধিবেশন ও মিশন অফিসে হইত।

বাহ্যতঃ উজানচর কৃষ্ণনগর এক গ্রাম বলিয়া বোধ হইবে। দুই গ্রামের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। এই রাস্তার পূর্বাংশেই উজানচর ও পশ্চিমাংশে কৃষ্ণনগর গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ১৩১৬ বাংলার পূর্বেই উজানচর স্কুলের কাজে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগর তাঁহার স্ব'শ্রুত বাড়ীতে থাকিয়াই তিনি স্কুলের শিক্ষকতার কাজ করিতেন।

অবশেষে তিনি মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই প্রতিবেশী কার্তিক চন্দ্র পাল এবং রাধারমন পাল মহাশয়গণের বাড়ীর এক অংশ লইয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমকে কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্ম আশ্রম বলা হইত। প্রথমতঃ কয়েক বৎসর ২১শে আষাঢ় এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব হইত। মিশনের হেড অফিস উজানচর হইতে ভোলাচং স্থানান্তরিত হওয়ার পর কৃষ্ণনগর আশ্রমের দক্ষিণাংশের অনেক স্থান নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় তখনই কৃষ্ণনগর আশ্রমও উঠাইয়া লওয়া হয়। তারপর বর্তমানে মিশন সভ্য জগদীশ চন্দ্র পাল তাঁহার বসত বাড়ী ও আশ্রম স্থান নিয়া শ্রীপাদপদ্ম আশ্রম নামে তাহার নিজ ব্যয়ে আর একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধন ভজন করিয়া আশ্রম সেবা করিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিয়াছেন কৃষ্ণনগরে ভবিষ্যতে একটি বিশেষ আশ্রম স্থাপিত হইবে। কৃষ্ণনগর আশ্রমেই মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য ইহাকে আনন্দপুরী বলা যাইতে পারে। এ স্থানে অগ্রণী মহাপুরুষগণ দয়াময় নামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মিশন প্রতিষ্ঠার পর ১৩২৬ বাংলা সন হইতে প্রতি বৎসর ৫ই পৌষ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিনে বার্ষিক উৎসবে বহু লোক সমাগম হইতে লাগিল। মিশনের সভ্য সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল ততই উৎসবে লোকের ভীড় বেশী জমিতেছিল। কুমিল্লা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার অনেক মিশন সভ্য উৎসবে যোগদান করিতেন। উৎসবে মিশনের আইন অনুসারে মিশনের সাধারণ সভা এবং পরিচালক সমিতির সভার কার্য নিয়মিত ভাবেই চলিত। একদিনে উৎসবের কাজ ও সভা সমিতির সব কাজ শেষ

করিতে অসুবিধা হইত এজন্য ১৩৩৭ বাংলা সনের উৎসব কালে সাধারণ সভায় ১লা পৌষ হইতে ১১ পৌষ পর্যন্ত ১১দিন সর্ব ধর্মোৎসব হইবে এ প্রস্তাব সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তদবধি মিশনের বার্ষিক উৎসব ১১দিন ব্যাপী কয়েক বৎসর মহাসমারোহে চলিত লাগিল। প্রতি বৎসর উৎসবের সময় উপাসনার জন্য সাময়িক ভাবে বিরাট প্যাণ্ডেল প্রস্তুত করা হইত। যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক যাত্রী নিবাস নির্মিত হইত। পান ভোজনের সুবিধার জন্য ষ্টল থাকিত। দয়াময়ের ভোগের জন্য এবং যাত্রীদের সেবার জন্য পাকশালার ব্যবস্থা হইত। উৎসবের সব কাজের সুবিধার জন্য এবং শৃঙ্খলার জন্য বহু উপযুক্ত কর্মী নিযুক্ত করা হইত। উৎসবের যাবতীয় কর্মের সুবিধা ও শান্তি রক্ষার জন্য অহোরাত্র ভলান্টিয়ার পার্টি পাহাড়া দিত। উৎসবে রোজ আরতি, জপ, গ্রন্থ পাঠ, সঙ্গীত ও নিয়মিত ভাবে উপাসনার শ্রোত বহিত। কোন দিন শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ প্যাণ্ডেলের মধ্যে সর্ব ধর্ম সম্পর্কে ও মিশন সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সর্ব ধর্মের ভবিষ্যৎ আশার বাণী শ্রবণ করিয়া অবাক হইত। উৎসবে রোজ শত শত ভক্তের সেবা হইত; অনেক কাঙ্গালী ভোজন হইত। সারারাত্রি আশ্রম বাড়ী আলোক মালায় সজ্জিত থাকিত। এমন নয়না-ভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিয়া এবং সঙ্গীতের অপূর্ব মাধুরী শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ পুলকে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। মলয়া ও সর্ব ধর্ম সঙ্গীত সারা রাত্রি উৎসব স্থানকে আনন্দমুখর রাখিত। আনন্দময়ের আগমনে আশ্রম বাড়ীতে উৎসব কালে স্বর্গরাজ্য

নামিয়া আসিয়াছে মনে হইত। সর্ব ধর্ম্মাখীদের বহু উপযুক্ত লোক সেবকভাবে উৎসবের যাবতীয় কার্য্য করিতেন। অনেক বিশিষ্ট মিশন সভ্য পায়খানা প্রস্তাবের স্থান রোজ পরিষ্কার করিতেন। দেশের সেবাই দয়াময়ের সেবা ইহাই তাহাদের অন্তরের কথা। এমন সেবার ভাব, এমন কার্য্যের শৃঙ্খলা, এমন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন কদাচিত্ দৃষ্ট হয়। উৎসব কালে সারা উজানচর ও কৃষ্ণনগর গ্রাম আনন্দ মুখর থাকিত। অনেক গ্রামবাসী উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দে বিভোর হইত। উজানচর বাজারে মিশন হেড অফিস থাকিলে ও মিশনের অফিসের যাবতীয় কাজ ও উৎসবাদি সবই তখন হইতে কৃষ্ণনগর আশ্রমেই সম্পন্ন হইত। ১৩৫৮ বাংলা সন পর্যন্ত মিশনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কৃষ্ণনগর আশ্রম।

স্কুলের কাজ হইতে অবসর গ্রহন !

মিশন প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ স্কুলের কাজ হইতে অবসর লইয়া শুধু মিশনের জন্য কার্য্য করিতে আদেশ পাইলেন। দয়াময়ের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একদিন তিনি স্কুল লাইব্রেরীতে এক সভায় স্বয়ং উপস্থিত স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। সভাতে স্কুলের শিক্ষক গণ উপস্থিত ছিলেন। স্কুল কমিটির মেম্বরগণও মিটিং এ যোগদান করিলেন। স্কুলের স্বত্বাধিকারী বাবু ভগবান চন্দ্র রায় সভাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন-“মাষ্টার বাবু আপনি যদি এই স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করেন তবে স্কুলের সুনাম আর থাকিবে না।

আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব।” স্কুল কমিটিও তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। শিক্ষকগণ তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ না করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিলেন, “দয়াময়ের প্রত্যাশে আমি অমান্য করিতে পারি না। আমাকে মিশনের কাজ করিতে হইবে। অতএব আপনারা সকলেই আমাকে আনন্দের সহিত বিদায় দিবেন, এই আমার শেষ অনুরোধ”। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বিষন্ন মনে বিদায় দিলেন। এই ঘটনার দিন আমি কৃষ্ণনগর আশ্রমে ছিলাম। পদত্যাগ পত্র দাখিলের সময় আমি শ্রীশ্রীর সাথে স্কুলেও গিয়াছিলাম।

মিশনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া কার্য্য করিতে তিনি সংকল্প করিলেন। তিনি অতঃপর পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দীনবেশ ধারণ করিলেন। পরনে ধূতী গায়ে একখানা চাদর ও হাতে লাঠি সম্বল করিয়াই তিনি মিশনের কাজের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। জুতা, জামা, ছাতা, কয়েক বৎসর তিনি ব্যবহার করেন নাই। দয়াময়ের আদেশেই তিনি কাঙ্গাল বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩২৮-বাংলা সনের আষাঢ় মাসে তিনি এই দীনবেশে কয়েকজন সঙ্গী লইয়া ময়নামতী অঞ্চলে (বর্তমান কমলাপুর কেন্দ্রের) ভারিকোটা, বাহেরী পাড়া ভ্রমণ করিয়া বিহার মন্ডল গ্রামে উপস্থিত হইলেন। বিহার মন্ডল আমার জন্মভূমি। সন্ত্যাকালে মিশন সভ্যা শ্রীযুক্তা রাজ কুমারী করের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন আমি সেদিন প্রবল জ্বরে

শয্যাগত। এ খবর পাইয়া তিনি উক্ত ভদ্র মহিলার বিশেষ অনুরোধে ঐ রাত্রি সেই বাড়িতেই সঙ্গীদের লইয়া অবস্থান করিলেন। সাধন ভজন করিয়া সারারাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যাকালেই শ্রীগুরুর আগমন বার্তা পাইলাম। আমার দুর্ভাগ্য প্রবল জ্বরের দরুন সেই রাত্রে শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করিতে পারিলাম না। রাত্রে মাতাঠাকুরাণী স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রী গুরুদেব বলিতেছেন কোন ভয় নাই। কামিনীর জ্বরের বিরাম হইবে। শেষ রাত্রে মা আমাকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে আমার জ্বরের বিরাম হইল। অতঃপর শ্রীগুরুর চরণ ধূলি লইয়া আশ্বস্ত হইলাম। সেই গ্রামের মিশন সভ্য কালী কুমার নাহা, শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের বাড়িতে পদধূলি দিতে প্রার্থনা জানালেন। তিনি সাদরে তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া ঐ বাড়িতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগমণ বার্তা শ্রবণ করিয়া গ্রামেরও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বাড়ী মহামেলার রূপ ধারণ করিল। কয়েকজন মুসলমান ফকির আসিয়া ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গণে নানা রকম অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ চক্ষু বুঝিয়া অনেকক্ষন ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। ফকিরদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তাঁহারা বাস্তবিকই ফকির-মহাপুরুষ। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা কোথায় চলিয়া গেলেন দেখিতে পাই নাই। দ্বিপ্রহরে উপাসনার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ

আহার করিতে বসিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। জ্বরের রোগী শ্রীগুরুর মহিমায় আহারীয় সবই সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় গ্রহণ করিলাম। ইহা দেখিয়া তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। আগন্তুক সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেবার আয়োজন অপরিপূর্ণ ছিল। আনন্দময়ের আগমনে সকলেই পরমানন্দ ভোগ করিলেন। আমাদের অঞ্চলে ইহাই তাঁহার প্রথম শুভাগমন।

সর্ব্ব ধর্ম প্রচারের জন্যই তিনি কুমিল্লা, ঢাকা ও ময়মসিংহ জেলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন, সেখানেই রোজ আরতি উপসনা হইত। অনেক সময় সঙ্গীতজ্ঞও তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সময় সময় তাহারা মলয়া ও সর্ব্ব ধর্ম গীতের অনেক সঙ্গীত পরিবেশনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করিতেন। উপাসনা কালেও তাহারা আদেশ মত সঙ্গীত করিতেন। সঙ্গী লইয়াই তিনি সব সময় ভ্রমণ করিতেন। প্রচারনের ফলে মিশনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জনবল বৃদ্ধির দরুন অর্থ বলও বাড়িতে লাগিল। যেখানেই তিনি যাইতেন সেইখানেই মিশনের চাঁদা ও দান সংগ্রহ করিতেন। মিশনের স্থায়ী আয়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ করিতেও চেষ্টা করিতেন এইরূপে প্রচার কার্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গ্রামাঞ্চলে বহুস্থানে পদব্রজেই ভ্রমণ করিতে হইত। শহরাঞ্চল ব্যতীত গ্রামে অনেক স্থানেই যানবাহনের ব্যবস্থা তখন ছিল না। সুতরাং বহু কষ্ট করিয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া মিশনের কার্য উদ্ধার করিতেন। অনেক পরিশ্রম করিয়া সময় মত আহালাদি না

করিয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতেন। সারাদিন পদব্রজে ভ্রমণ করিলেও তাঁহাকে কদাপি পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতনা। শিষ্টা-চার, ভদ্রতা, বিনয় তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে তাপিত প্রাণও শীতল হইত। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই আনন্দের মেলা বসিত। মিশন সাধনাই তাঁহার জীবন ব্রত ছিল। কি প্রকারে শ্রী আনন্দের ধর্ম মত জগতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য অহোরাত্র যাবতীয় কার্য্য করিতেন ও সাধন করিতেন। সর্বত্রই মিশনের সভ্যগণকে উপযুক্তরূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন। কি প্রকারে জগতের ঘরে ঘরে দয়াময় নাম প্রচার হইতে পারে- জগত মুক্ত হইতে পারে-ইহাই ছিল তাঁহার জীবন সাধনা। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিতেন শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজই জীবন মুক্তির আদর্শ। তিনি দয়াময় নাম লইয়াই আজীবন তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নাম সকলের অন্তরে একভাবে এবং সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইবে। জগতের রোগ, শোক, মৃত্যু এই নামের গুণেই বিদুরিত হইবে। প্রত্যেকেই এই নাম নিয়া জীবন মুক্তির সফলতা লাভ করিবে। দয়াময় রাজ্য জগতের আদর্শ হইবে। সর্বাত্মে জগতের মধ্যে এই নামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই এই সর্ব ধর্ম মিশন। এই মিশনের মধ্যেই দয়াময় জগতের সমুদয় প্রতিকার প্রতিষ্ঠা করিবেন। শরীর ও আত্মা এবং উভয়ের ভাব ও কার্য্যের ঐক্যই মুক্তি-ইহাই সিদ্ধ যোগ। এ জন্য দয়াময়ের নামের কার্য্যই মিশনের প্রত্যেক বিষয়ে সাব্যস্ত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা

সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠার পর মিশনের উন্নতি কল্পে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ স্থানে স্থানে মিশনের কেন্দ্র গঠন করিতে মনস্থ করিলেন। স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিশনের কেন্দ্র স্থাপন করিতে অজেয় সঞ্চয় লইয়া বন্ধপরিবর হইলেন। আশ্রম গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি পদব্রজে কুমিল্লা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে সঙ্গীদের লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশ্রম সম্বন্ধে তিনি অন্তরে যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

“আদর্শ সিদ্ধির প্রয়োজনেই আশ্রমাদি বিহিত হইয়াছে। যে স্থানে সর্ব ভাবে সাধন ভজন হইতেছে- জীবন মুক্তির উপাসনা হইতেছে এবং “ধর্ম চক্রের” বিশুদ্ধ নীতি অনুসৃত হইতেছে উহাকেই আমাদের প্রয়ো-জনানুসারে আশ্রম বলিতে পারি। সাধন বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-যোগেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে পরেই পাপাচার নির্দেশিতার সহিত নির্মূল হইয়া যায় এবং সর্ব জীবনের মধ্যে সাধনার ফল শান্তির অমৃত প্রস্রবণ মধ্য বিন্দু যোগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে জানিবে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা শক্তিতে আশ্রমের জীবন স্থাপিত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ ধর্মের প্রেরণা ভিন্ন অন্য ভাবনার প্রতি যাহাদের হৃদয়ের গতি আছে তাহাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা সমীচীন মনে হইতেছে না। তুমি দেখিবে ধরিত্রীর স্বর্গোপম ভূমি আশ্রম যে স্থানেতে ত্রিভুবনের শক্তি প্রকৃতি পুরুষ

যোগেতে ইষ্ট বিশ্ব স্রষ্টার অনুসন্ধানে ছুটিতেছে ও প্রাতে এবং সায়াহ্নে সংকীৰ্তন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের স্তুতি করিতেছে। নিশ্চয় জানিবে দয়াময় সৰ্ব্ব ধাম বিশুদ্ধ ভাবে আশ্রমের মধ্যে রাখিবেন। এ স্থান জীবন মুক্তির ক্ষেত্র। ইহাতে অবিশ্বাসের, কোন হেতু নাই সুতরাং নিম্নে যে চারিটি নিয়ম কথিত হইল এই সকল নিয়মের মধ্যে আশ্রম বাটীর কার্য হইবে।

- (১) স্বামী স্ত্রী সাধন পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক।
- (২) বিশ্ববাসীর কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক।
- (৩) বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগের সিদ্ধি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যিক।
- (৪) জীবন মুক্তির সৰ্ব্ব প্রকারের সফলতা সত্য স্বরূপে অবিচ্ছেদে প্রতিনিয়ত কার্য করা প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মিশন সভ্য হইতে সম্পত্তি দান সংগ্রহ করিয়াই অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কোন স্থানে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াই আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রত্যেক আশ্রমেরই নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের তারিখও তিনি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কয়েকটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলিতেন রামকৃষ্ণপুর, বরকাতা, কমলাপুর, ভোলাচং এবং কৃষ্ণনগর আশ্রম মিশনের মধ্যে কার্য কেন্দ্র মূলে রহিল। এই পাঁচটি আশ্রম লইয়াই পৃথিবীতে সকল বিষয়ে সাধন সিদ্ধ হইবে। কৃষ্ণনগরে যে আশ্রম হইবে তদ্বারা জগতের কার্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাত হাজার আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলেই মিশন জগত লইয়া কার্য

করিতে পারিবে এই সত্য তিনি এক উপাসনার বাণীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণপুর গণপতি আশ্রম

রামকৃষ্ণপুর নিবাসী নবদ্বীপ চন্দ্র রায়, কার্তিক চন্দ্র সাহা ও আবদুল বারিক ভূইয়া সৰ্ব্ব ধর্মের লোক ছিলেন। আজীবন তাহারা শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে মান্য করিয়াই সংসার ও ধর্ম সাধনা লইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণপুর গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁহাদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই সঙ্গতি সম্পন্ন লোক ছিলেন। বহু আলোচনার পর আবদুল বারিক ভূইয়া সাহেব আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সম্পত্তি দান করিলেন। এই দানের ভূমিতেই ১৩২৩ বাংলা সনে রামকৃষ্ণপুর গণপতি আশ্রম স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কালীকচ্ছের স্বনাম ধন্য মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়কে আহবান করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর এই আশ্রমের কার্য নিয়মিতভাবেই চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৩৩১ বাংলা সনে আনন্দময়ী নামে এই গ্রামের মিশন সভ্যা তাঁহার একমাত্র বসত বাড়ী মিশনে দান করিলেন। আনন্দময়ী ধর্ম প্রাণ নিষ্ঠাবতী বিধবা রমণী ছিলেন। শ্রীগুরু প্রতি তাহার অচলাভক্তি ছিল। শ্রীগুরুর আদেশেই আনন্দময়ী তদবধি আশ্রমের সেবার ভার লইলেন। ইত্যবসরে কুলক চন্দ্র সাহা মিশনের আর একজন একনিষ্ঠ সেবক আনন্দময়ীর সঙ্গে এক যোগে আশ্রমের সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই জনের মধ্যে খুব এক প্রাণতা ছিল।

উভয়েই আশ্রম সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া লইলেন। তখন আনন্দময়ী দানকৃত বাটীতে থাকিয়াই তাহারা আশ্রম সেবা করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর দানকৃত বসত বাড়ীর একটু দূরে আশ্রম ছিল। এজন্য রোজ রোজ দূর হইতে যাইয়া আশ্রমের যাবতীয় সেবার কার্য করা বড়ই অসুবিধা হইত। এজন্য শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আশ্রম হইতে আসন ঘর উঠাইয়া আনন্দময়ীর দানের বাড়ীতে দয়াময়ের আসন স্থাপন করিয়া দিলেন। তদবধি ইহাই রামকৃষ্ণপুর গণপতি আশ্রম বলিয়া পরিগৃহীত হইল। পরে উপাসনার ঘর ও অন্যান্য ঘর প্রস্তুত করিয়া আশ্রমের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। কুলক সাধু ও আনন্দময়ী অনেক দিন যাবত আশ্রম সেবা করিয়া উভয়েই পরলোক গমন করেন। ১৩৪৩ বাংলা সনে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপাসনায় শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল-

ক) ভবিষ্যতে সর্ব ধর্মের দীন দরিদ্র লোকই এই আশ্রম হইতে সাহায্য পাইবে।

খ) অন্যেরাও সাহায্য পাইতে পারে।

গ) একজন লোক আশ্রমটির জন্য আসিয়া ইহার উন্নতি করিবে।

ঘ) আরও কিছুদিন আশ্রমের অসুবিধা থাকিবে। পরে আশ্রমের উপকার বা সাহায্য না করিয়া কেহই সুখে থাকিতে পারিবে না।

ঙ) উপাসনা গৃহ ২০ হাত × ১১ হাত হইবে। চতুর্দিকে টব বারিন্দা হইবে।

চ) পরে উপাসনা গৃহ দ্বিতল দালান হইবে।

ছ) জগত বাসীর অর্থ পিপাসা বেশী। কেহই নিজের স্বার্থ ভুলিয়া দেশের নিমিত্তে ধন দৌলত উৎসর্গ করেনা। এজন্যই পৃথিবী এরূপ অশান্তির আলেয়ে পরিণত হইয়াছে।

জ) মিশনের এই আশ্রম শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করা গেল।

খগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামের একজন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যে কোন অমানুষিক কার্য করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এজন্য গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। আশ্রমের কার্যকলাপ দেখিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে তিনি মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিতেন। একদিন কৃষ্ণনগর যাইয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের নিকট তাঁহার জীবনের কয়েকটি দুঃসাহসিক ঘটনা সরল মনে ব্যক্ত করেন এবং তাহার জীবন শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করেন। তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু তাহার জীবন সংশোধন করিবেন মনে স্থির করিলেন। তাহাকে নাম জপ করিতে দিলেন। কিছুকাল পরে খগেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি আশ্রয় প্রার্থী হইলে শ্রীগুরু তাহাকে কৃষ্ণনগর মিশন বাড়ীতে আশ্রয় দান করেন। শ্রীগুরু তাহাকে পাইয়া সঙ্গী করিয়া লইলেন। তিনিও খুব নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুর সঙ্গে থাকিয়া মিশনের কার্য করিতেন। শ্রীগুরু তাহার জীবন সংশোধনের জন্য সর্বদাই নাম জপ করিতে দিতেন। কিছুকাল পর শ্রীগুরুর নির্দেশেই খগেন্দ্র বাবু সর্ব ধর্ম্মানুসারে শৈলজা সুন্দরীকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন মিশন সেবা করিয়াই পরলোক গমন করেন।

ভোলাচং জয়দুর্গা আশ্রম

ভোলাচং নিবাসী গগন চন্দ্র পাল একজন নিঃসন্তান মিশন সভ্য ছিলেন। ১৩২৮ বাংলা সনে তিনি তাঁহার বসত বাড়ী, পুষ্করিণী ও ফসলের জমি প্রায় ৩ একর সম্পত্তি সম্যক মিশনে দান করেন। তদবধি এখানেই জয়দুর্গা আশ্রম স্থাপিত হয়। গগন চন্দ্র পাল জীবিত কাল পর্যন্ত এই আশ্রমেই সস্ত্রীক সেবক হিসাবে বাস করিতেন। ১৩৫২ বাংলা সনে মিশন সভ্য পঞ্চানন্দ পাল ও বৈকুণ্ঠ কুমার পাল তাহাদের বসত বাড়ী মিশনে দান করেন। ১৩৫৮ বাংলা সন পর্যন্ত আশ্রমের কার্য নিয়মিতভাবে এইখানেই চলিতে থাকে। কৃষ্ণনগর আশ্রমের দক্ষিণাংশের অনেক স্থান নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় মিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে উজানচর কৃষ্ণনগর হইতে মিশন হেড অফিস ১৩৫৮ বাং সনের কার্তিক মাসে ভোলাচং জয়দুর্গা আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি ভোলাচং জয়দুর্গা আশ্রমের কার্য স্থগিত রাখা হয়। মিশনের হেড অফিস বর্তমানে স্থায়ী ভাবে এখানেই কার্য করিতেছে।

১৩৪০ বাংলা সনের ১৭ই ফাল্গুন এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ নিম্ন লিখিত বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন:-

“ছত্রিশ হাজার নামেতে মিশন এই বাড়ীতে আজ কার্য সিদ্ধ করিয়াছে। দয়াময়ের কার্য দ্বারা এই বাড়ী এমন কি এই গ্রাম এবং চারিপার্শ্বের স্থানাদিও তীর্থে পরিণত হইয়া গেল। যতদিন জগত আছে ততদিনই এখানের কার্য রহিবে। মৃত মানুষ এখানেই আসিয়া সকলের বিশ্বাস ভক্তি জাগরিত করিবে।

অদ্যাবধি এই স্থলের জন্যে সর্ব ধর্ম মিশন চিরকালের নিমিত্তে সিদ্ধ হইল। দয়াময় মন্ত্র চিরকালের জন্যে স্ত্রী বা পুরুষ লাভ করিতে বাধ্য। অতএব মিশনের কার্য দ্বারাই এখন হইতে সকলের মধ্যে ধর্ম জীবনের সর্বপ্রকারের ধর্ম জীবনের দূরীকৃত হইবার কারণ আসিয়াছে। দয়াময় এখন এই বাড়ীতেই কার্যভার নিয়া উপাসনাদি সকল বিষয়ের লীলা প্রতিষ্ঠা করিবেন।

বরকান্তা আনন্দ আশ্রম

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার গুরুদেব শ্রীআনন্দের নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বরকান্তা আগমন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ও শশীভূষণ রায় চৌধুরী ৪৮ শতক ভূমি আশ্রমের জন্য মিশনে দান করেন। এখানেই ১৩৪৪ বাংলা সনে আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ৩ কার্তিক আনন্দ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বৈকুণ্ঠ কুমার কর, কামিনী কুমার কর ও হর কুমার কর তিন ভ্রাতা মিলিয়া আরও কিছু সম্পত্তি মিশনে দান করেন। পরবর্তী কালে বৈকুণ্ঠ কুমার দাস ও মনোমোহন দাস প্রায় দেড় একর সম্পত্তি মিশনে দান করিলে আশ্রমের খুব উপকার হয়। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ এই আশ্রমে থাকিয়া অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়া আশ্রমের কলেবর বৃদ্ধি করেন। তাঁহার নির্দেশে বহু আসবাব ও তৈজস পত্র সংগৃহীত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর আনন্দ আশ্রমের দয়াময়ের আসন ঘর পাকা মন্দির করিয়া দেন। কামিনী কুমার কর এই পাকা মন্দিরের সব খরচ

বহন করেন এবং দয়াময়ের সেবা পূজার জন্য আরও কিছু সম্পত্তি মিশনে দান করেন।

আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আমাকে আশ্রমের সেক্রেটারী এবং কৃষ্ণকুমার সাধুকে আশ্রমের সেবাইত নিযুক্ত করেন। আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে এই সাধু মহাত্মা শ্রীগুরুর আদেশেই দয়াময় নাম প্রচার করিবার জন্য তাহার জন্মভূমি মধ্যনগর হইতে বিহার মন্ডল গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। এতদঞ্চলে দয়াময় নাম প্রচার করিয়াই তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি প্রতিনিয়ত সস্ত্রীক সাধন করিতেন। তাহার দুইটি কন্যাও তাহার সঙ্গে ছিল। সকলেই সাধু বলিয়া তাহাকে সম্মান করিত। তাহার প্রচারণার ফলে এতদঞ্চলে অনেক লোক মিশন সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। ১৩৪৭ বাংলা সনের বরকামতা আনন্দ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ যোগদান করেন। উৎসবের পর একদিন হঠাৎ কৃষ্ণ কুমার সাধু পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। পরদিন ভোর বেলায় ক্রমেই তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। শ্রীগুরু সাধুর অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া তাহার নিকটে বসিয়াই তাহার পরলোক জয় যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সাধক প্রবর শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করিতে করিতে ভবলীলা সংবরণ করেন।

সাধুর মৃত্যুর পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তাহার শব দেহ সামনে রাখিয়া বহু লোক লইয়া তাহার জীবন মুক্তির জন্য উপাসনা করেন। তৎপর আনন্দ আশ্রমের উত্তর পার্শ্বে মহা সমারোহে

তাহার পূত দেহ সমাহিত করা হয়। সমাধি হওয়ার পরদিন শ্রীগুরু ভোগ দিয়া ভান্ডারা করিয়া ছিলেন। সাধু ভাগ্যবান ছিলেন। ধন্য তাহার জীবন। আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিয়াছেন-

১) আনন্দ আশ্রম জগতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবে। এই আশ্রমের কার্য্য দ্বারা জগতে ঐশ্বর্য্য ভোগের কামনা শেষ হইবে।

২) ক্রমে ইহাতে আরও বহু জায়গা যুক্ত হইবে।

কমলাপুর অশোক আশ্রম

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কমলাপুর একটি আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ মিশন সদস্য নবদ্বীপ চন্দ্র রায়ের সহিত আশ্রম সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি কয়েকবার নবদ্বীপ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টার পর ২০৬ শতাংশ জমি খরিদ করিয়া লওয়া হয়। তারপর ১৩৪৪ বাংলা সনে কমলাপুর আশোক আশ্রম স্থাপিত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দয়াময়ের মন্দির পাকা করিবার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বহু চেষ্টার পর মন্দির পাকা করা হয়। মন্দির নির্মাণের জন্য মিশন হইতেও কিছু দেওয়া হয়। দান সংগ্রহ করিয়াই মন্দিরের কাজ সম্পন্ন করা হয়। কমলাপুর অশোক আশ্রমেই সর্ব প্রথম দয়াময়ের মন্দির পাকা হয়। পরবর্তী কালে নবদ্বীপ বাবু তাহার যাবতীয় সম্পত্তি মিশনে দান করিয়া সস্ত্রীক আশ্রমের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। বর্তমানে তাহার স্ত্রীও দয়াময় নাম প্রচার করিয়া আশ্রম সেবা

করিতেছেন। ধীরে ধীরে কমলাপুর কেন্দ্রের আরও কয়েক জন মিশন সভ্য মিশনে সম্পত্তি দান করিয়াছেন। বর্তমানে কমলাপুর কেন্দ্রেই মিশনের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ অন্যান্য কেন্দ্র হইতে অধিক। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন “জগতের মহা শুভলগ্নে আজ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ভবিষ্যতে এই আশ্রমের খুব উন্নতি হইবে”। তিনি আরও বলিয়াছিলেন-“এই আশ্রম দ্বারা কর্মচারী দিগের জীবনে ধর্মের জন্য ত্যাগের ভাব জাগিবে। জনসেবার কার্য এই আশ্রম করিবে। এই আশ্রমের কৃষিখলা-খামার করিতে হইবে।”

কাঁঠালিয়া মনোমোহন আশ্রম

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ শিশুকালেই তাঁহার জন্মভূমি বেগমাবাদ হইতে এই কাঁঠালিয়া গ্রামে আসিয়া আবাস ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ তিনি আশ্রমের জন্য অল্প পরিসর একটি স্থান করিয়া লইলেন। তৎপর ১৩৪৭ বাংলা সনে মিশন সভ্য গোবিন্দ চন্দ্র পাল আশ্রমের জন্য চারি কানি সম্পত্তি দান করেন। ১৩৫২ বাংলা সনে দ্বারকা নাথ পালও কতক সম্পত্তি দান করেন। এই সব সম্পত্তি লইয়া আশ্রম গঠিত হয়। পরবর্তী কালে ভারত চন্দ্র পাল আরও কিছু সম্পত্তি দান করেন। তিনি আশ্রমের দয়াময়ের মন্দিরও পাকা করিয়া দিয়াছেন। অমৃত লাল পাল বহু বৎসর সম্পাদক হিসাবে এই আশ্রমে কাজ করিয়া আশ্রমের গৃহ নির্মাণ আসবাবপত্র এবং তৈজস পত্রের ব্যবস্থা করিয়া আশ্রমকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়াছেন। স্থানীয় মিশন

সভ্যগণের আগ্রহে এই আশ্রম ক্রমেই উন্নতির পথে দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

কাঁঠালিয়া মনোমোহন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিয়াছেন-“এই গ্রামের মধ্যে স্বাধীন ভাবে সামাজিক সংস্কার অগ্রসর হইবে এবং জগতে সর্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আশ্রম ধনধান্যে পূর্ণ হইবার সাধন আসিল।”

নরসিংদী ভাগবত আশ্রম

১৩৫৭ বাংলা সনে মিশন সভ্য বিহারী মোহন সাহা নরসিংদী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার বসত বাড়ী মিশনে দান করেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ প্রথমতঃ অল্প পরিমাণ স্থান পাইয়াই নরসিংদী ভাগবত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৬৩ বাংলা সনে সুর বালা সাহা তাহার বসত বাড়ী মিশনে দান করেন। তারপর আশ্রমের যাবতীয় কার্য করিতে আর অসুবিধা হয় নাই। আশ্রম বাড়ীর সংলগ্ন আর একটি অংশের মালিক ছিলেন বিচিত্রা সুন্দরী সাহা। তিনি বিধবা রমণী ছিলেন। তিনিও ১৩৬৩ বাংলা সনে তাহার ঘরবাড়ী আশ্রমে দান করেন। এই তিন জনের সম্পত্তি লইয়াই বর্তমানে ভাগবত আশ্রমের কার্য চলিতেছে। কয়েক বৎসর যাবত নরসিংদী কেন্দ্রের মিশনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়ায় ভাগবত আশ্রম উন্নতির পথে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরতিতে প্রতিদিন বহু সর্ব ধর্মার্থী যোগদান করেন। রবি বাসরীয় উপাসনায় ও বহু ভক্ত সমাগম হয়। আশ্রমে বৈদ্যুতিক আলো থাকায় রাত্রিতে আরতি, কীর্তন ও নাম জপাদি

কার্যে বহু মিশন সভ্য যোগদান করিয়া সাধন ভজন করিতে সুবিধা পাইতেন। প্রায়ই রাত্রিতে গায়কগণ সর্ব ধর্ম গীত ও মলয়ার সঙ্গীত চর্চা করিয়া আশ্রমকে আনন্দ মুখর করিয়া তুলেন।

মেন্দিপুর জয়দুর্গা আশ্রম

ময়মনসিংহ নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত মেন্দিপুর নিবাসী শরত চন্দ্র পাল মিশনের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৩৩৯ বাংলা সনে নদীরাম পাল, শরত চন্দ্র পাল ও রমণী মোহন পাল এই তিন ভ্রাতা ৯৫ শতক ভূমি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মিশনে দান করেন। এই সম্পত্তি লইয়াই পরবর্তীকালে জয়দুর্গা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের উন্নতি কল্পে শরত চন্দ্র পাল আরও ১২৫ শতাংশ শাইল ধানের জমি দান করেন। আশ্রমে সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীও শরত বাবু খনন করিয়া দিয়াছেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর তিনি আশ্রমের দয়াময়ের মন্দির পাকা করিয়া দেন। আশ্রমের গৃহাদি নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমস্তই শরত বাবু নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিয়াছিলেন, জয়দুর্গা আশ্রমের সমস্ত কাজ শেষ হইলেই শরতবাবু পরলোক চলিয়া যাইবেন। আশ্রমের গঠন কার্যের পূর্বে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তিনি শেষ জীবনের কয়েক বৎসর নানা রোগে ভুগিতেছিলেন। কার্যতঃ দেখা গেল আশ্রম গঠনের যাবতীয় কার্য শেষ হইলেই তিনি শান্তির সহিত পরলোক গমন করেন। তিনি পুণ্যত্মা ও ভাগ্যবান ছিলেন।

জলম ভারতী আশ্রম

জলম নিবাসী দীননাথ দেব একজন নিষ্ঠাবান মিশন সভ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর আদেশে তিনি ১৩৫২ বাংলা সনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৯ শতাংশ জমি মিশনে দান করেন। তারপর জলম কেন্দ্রের আরও কয়েকজন মিশন সভ্য ভারতী আশ্রমের উন্নতির জন্য ২৪৮ শতাংশ জমি দান করেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের নির্দেশেই তাহারা আনন্দের সহিত সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ১৩৬৪ বাংলা সনে জলম ভারতী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে জলম কেন্দ্রে মিশনের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতী আশ্রমের উন্নতি হইতে থাকে।

আউটপাড়া নারায়ণ আশ্রম

ময়মনসিংহ জেলার আউটপাড়া নিবাসী অমর চাঁদ পাল ১৩৫২ বাংলা সনে তাহার বসত বাড়ী, গৃহ, পুষ্করিণী ও কতক ফসলের জমি মিশনে দান করেন। তৎপর তাহার ভ্রাতা যতীন্দ্র চন্দ্র পালও তাহার বসত বাড়ী ও পুষ্করিণী মিশনে দান করিয়া এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই দানের ভূমিতেই নারায়ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। আউট পাড়া গ্রামের অনেক লোক মিশনের সভ্য হওয়ায় সকলের সমবেত যত্নে ও চেষ্টায় নারায়ণ আশ্রম গড়িয়া উঠে। ময়মনসিংহ শহরের অনেক লোক মিশনের সভ্য হওয়ায় আশ্রমের উপকার হয়।

বহরীয়া সর্ব সমাজ আশ্রম

চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরে বহরীয়া গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে অশ্বিনী কুমার দত্ত মিশনের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই ভাইপো সকলেই মিশন সভ্য ছিলেন। তাহাদের আহবানে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ একদা বহরীয়া গিয়াছিলেন। এক বাড়ীতে অনেক মিশন সভ্য দেখিয়া এবং মিশনের প্রতি তাহাদের ভক্তি বিশ্বাস দেখিয়া তিনি সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। বহু আলোচনার পর অশ্বিনী বাবু বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১১৫ শতাংশ বাড়ী মিশনে দান করেন। দানের সম্পত্তির মধ্যে একটি পুষ্করিণীও ছিল। ১৩৩৫ বাংলা সনের পর বহরীয়া সর্ব সমাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই আশ্রমের আসন ঘর, উপাসনা গৃহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী কালে দয়াময়ের পাকা মন্দির হয়। স্থানীয় মিশন সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় আশ্রমের গৌরব বাড়িতে থাকে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় তিন বৎসর পূর্বে বর্তমানে মেঘনা নদীর তীরস্থ বহু গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। বহরীয়া গ্রামের ও পূর্বাংশের সাধারণ স্থান ব্যতীত গ্রামের সমস্ত লোকের বাড়ী ঘর, সম্পত্তি সব নদী গর্ভে পতিত হয়। সর্ব সমাজ আশ্রমও নদীর

অতল জলে বিলীন হইয়া যায়। তৎপর আশ্রমের সেক্রেটারী নগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাহার ভ্রাতাদের সহিত বহরীয়া গ্রামের পূর্বাংশে এক সাধারণ জমির উপর বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ঐ বাড়ীর একপার্শ্বে সর্ব সমাজ আশ্রমের আসন ঘর, উপাসনা ঘর লইয়া সাময়িক ভাবে আশ্রমের কার্য চলিতেছে।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কুমিল্লা জেলার লাউর ফতেপুর গ্রামে ও ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার বড়ছিট গ্রামে সর্ব ধর্ম মিশনের আরও দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। কালক্রমে স্থানীয় উপযুক্ত পরিচালকের অভাব হেতু এবং অন্যান্য আরও অসুবিধার দরুন আশ্রম দুইটিকে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

যতই আশ্রমের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ততই মিশনের জনবল ও অর্থবল বাড়িতে লাগিল, প্রচার কার্যও ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। প্রত্যেক আশ্রমেই নির্দিষ্ট তারিখে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইতে থাকে। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অনেক উৎসবেই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উৎসবের কার্য সম্পন্ন করিতেন। ঈশ্বর প্রীতির জন্য, ধর্মের প্রসারের জন্য ও জগতের মঙ্গলার্থেই উৎসব বিহিত হইয়াছে। উৎসব কালে উপস্থিত ধর্ম বন্ধুদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে, প্রেম প্রীতির জাগরণও বাড়িতে থাকে- আনন্দের ঢেউ সকলের প্রাণে উথলিয়া উঠে।

ইহাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। স্বজাতি, বিজাতি, ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু ইত্যাদির কোন বালাই সর্ব ধর্মোৎসবে পরিদৃষ্ট হয় না। “একাকী নয় জগত লয়ে চলরে আনন্দ হয়ে” এই মহারাজ্যের প্রতিধ্বনি সকলের অন্তরে জাগিয়া উঠে। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিতেন “সারা বৎসর বাড়ীতে থাকিয়া সাধন করিলে সাধনে যতটুকু অগ্রসর হয় উৎসবে আসিয়া নিয়মিত ভাবে কার্য করিলে একদিনেও সে পরিমাণ সাধন সিদ্ধ হইতে পারে। উৎসব কালে তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে লইয়া সাধারণ সভায় সর্ব ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন এবং মিশনের উদ্দেশ্যও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেন। তিনি যখন যে আশ্রমে যাইতেন আশ্রমের পরিচালক সমিতির সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া আশ্রমের উন্নতির জন্য বহু আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন-মিশনের কার্য নিয়া যাহারা ঈশ্বর লাভের সাধন করিবে তাহারাই ধর্মের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিবে। প্রত্যেক আশ্রমের মন্দির, উপাসনা গৃহ ও অন্যান্য ঘরের ব্যবস্থা অগ্রে করিতেন। স্থায়ী আয়ের নিমিত্ত কেন্দ্রের সামর্থবান মিশন সভ্যগণের নিকট ভূমি দান চাহিয়া লইতেন। জলের সুবিধার জন্য কখন কখন পুষ্করিণী বা নলকুপের ব্যবস্থা করিতেন। প্রত্যেক আশ্রম গড়িয়া উঠিতে পারে, বিত্ত অর্থের সংস্থান হইতে পারে, কেন্দ্রের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে, জাতিগত পার্থক্য এবং

ধর্ম গত অনৈক্য ভুলিয়া সকলেই দয়াময় নাম সাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে ইহাই ছিল তাহার আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

এজন্য তিনি সর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত টাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলায় কয়েক বৎসর বহু পরিশ্রম করিয়া ১১টী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আশ্রমগুলি সুপরিচালনার্থে প্রত্যেক আশ্রমেই কেন্দ্রের নয়জন বিশিষ্ট সভ্য লইয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। ঐ নয়জন হইতে একজন সম্পাদক বাছিয়া লইতেন। আশ্রমগুলির উন্নতি কল্পে তিনি সব আইন বিধিও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন মিশনের আইনগুলি আমার কল্পনা সম্মত নহে। দয়াময়ের আদেশেই সমস্ত আইন কানুনের প্রণয়ন করা হইয়াছে। অবশ্যই দেশ কাল ভেদে মিশনের যে কোন আইন পরিচালক সমিতি রদ-বদল করিতে পারিবে ইহাও তিনি সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় তীর্থ ভ্রমণ

শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ ১৩৪৫বাংলা সনে তীর্থ ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পৌষ মাসে মিশনের বার্ষিক উৎসব কালে তিনি অনেকের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণের আলোচনা করিলেন। অনেক আলোচনার পর ২৫ জন তাহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন স্থির হইল। মাঘ মাসে ভ্রমণের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া তিনি সকলের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন। সকলেই যথা সময়ে কৃষ্ণনগর আশ্রমে তীর্থ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। প্রথমতঃ তিনি সদল বলে নারায়ণগঞ্জ হইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে তিনি ৩ দিন অপেক্ষা করিলেন। শ্রী গুরু সঙ্গ পাইয়া সঙ্গীগণ সকলেই আনন্দে আত্মহারা। তৎপর তিনি সকলকে লইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দুই দিন অবস্থান করিলেন। রোজই আরতি ও উপাসনার কার্য্য রীতিমত চলিতে লাগিল। গয়ার কাজ শেষ করিয়া তিনি সঙ্গীদের লইয়া কাশীধামের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। কাশীতেও তিনি ৫/৬ দিন বাস করিয়াছিলেন। সাধনার কার্য্য রোজই নিয়মিত ভাবে চলিত। অনুপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও অন্যান্য দেব দেবী দর্শন করিয়া সকলেই তীর্থের কাজ সমাধা করিলেন। কাশির দর্শনীয় সব দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তৎপর তিনি প্রয়াগ তীর্থ গমন করিলেন। তখন প্রয়াগে কুম্ভ মেলা চলিতেছিল। শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ সঙ্গীগণকে লইয়া কুম্ভমেলার মধ্যে এক ধর্মশালায়

৮/১০ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। রোজই প্রাতঃসন্ধ্যায় আরতি হইত, উপাসনাও রোজ রোজ ঠিকমত চলিত। সঙ্গীগণ রোজই কুম্ভমেলার সাধু দর্শন করিতে বাহির হইতেন। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থলেই প্রশস্ত বালু চড়ায় কুম্ভ মেলার স্থান ছিল। শত শত সাধু সন্ন্যাসী এই মেলায় অবস্থান করতঃ ধর্ম সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই মহামেলায় বহু তীর্থ যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। ধর্মের এত বড় মহামেলা কশিৎ দৃষ্ট হয়। মেলার ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় সাধু মহাত্মারা জপ, তপ, ধ্যান, কীর্তন করিতেছেন। সকল মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্মের আচরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কুম্ভ মেলা ব্যতীত কোন ধর্ম স্থানেই বহু ধর্মের সমাবেশ এক স্থানে দেখা যায় না। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজও কুম্ভ মেলার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া বহু সাধু মহাত্মা দর্শন করিয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনের এক পাণ্ডা কুম্ভ মেলা হইতে সকলকে লইয়া বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। বৃন্দাবন আসিয়াই তিনি ভাবিতে ছিলেন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিয়া ছিলেন-এখানেই তিনি নিকুঞ্জ কাননে ধর্মের কতলীলা করিয়াছিলেন-এই খানেই তিনি প্রেম সাধনা পূর্ণ করিবার জন্য ব্রজ গোপী নিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন-এখানেই তিনি তাহার সঙ্গীগণকে লইয়া গোচারণ করিতেন-এখানেই একদিন ব্রজা তাহার গোধন হরণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সাধের বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই তিনি চির বিরাজমান আছেন।

এসব চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার বাসস্থানের সম্মুখে যে দেওয়াল ছিল তাহা আর দেখা যাইতেছেনা। তিনি দেখিতে ছিলেন সম্মুখে সুদূর প্রসারী পুণ্যতোয়া যমুনা লহরে লহরে স্নিগ্ধ সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এ মনোরম দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিহবল হইয়া পড়িলেন। তিনি আরও দেখিলেন যমুনার উপর দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতি রাধা তাহার দিকে আসিতেছেন। এই মহাপবিত্র মিলন যোগ দর্শন করিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন। তৎপর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা স্থান দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনের স্বনামধন্য মহাপুরুষ সম্ভদাস বাবাজী মহারাজ একদিন তাঁহাকে সঙ্গীদের সহ নিমন্ত্রণ করিয়া পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের কাজ শেষ হইলেই এখান হইতে অধিকাংশ সঙ্গী শ্রীগুরুর আদেশে লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অল্প কয়েক জন সঙ্গী লইয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মিশনের প্রবীন সভ্য চন্দ্র কুমার দত্ত তখন দিল্লীর একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি চন্দ্র কুমার বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরুকে পাইয়া চন্দ্র কুমার বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া ছিলেন। গুনিয়াছি এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়াই তিনি হরিদ্বার ভ্রমণে বাহির হইলেন। হরিদ্বার বহু সাধু সন্যাসীর সাধন ভূমি। অনেক মহাপুরুষ সেখানে সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানেই শঙ্করাচার্য্য ব্যাস দেবের সাধন

গুহায় বহু প্রচেষ্টা করিয়া বেদান্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। হরিদ্বার ভ্রমণ শেষ করিয়া অবশেষে তিনি পুরী ধামে গমন করিলেন।

শ্রী ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি বিমলা দেবীর মন্দিরের সংলগ্ন কোন এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। পুরী অবস্থান কালে তিনি ভাবিতেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুর হাত পা কাটা। এরূপ বিকলাঙ্গ মূর্তি তিনি দেখিতে পছন্দ করিতেন না। যদি শ্রী মন্দিরে ভগবানের এই মূর্তি দর্শন করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা হয় তবে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। তিনি বাসস্থান হইতে রোজই দেখিতে পাইতেন মন্দিরে শ্রী ভগবান বিগ্রহের দর্শন প্রার্থী বহু লোকের ভিড় হইতেছে। এত ভিড়ের মধ্যে কীরূপে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভগবৎ বিগ্রহ দর্শন করিবেন এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবানের কি অপূর্ব লীলা পুরীর যে বাড়ীতে তিনি সঙ্গীদের লইয়া বাস করিতে ছিলেন ঐ বাড়ীর মালিক ছিলেন শ্রী মন্দিরের একজন তীর্থ গুরু। একদিন প্রাতঃকালে ঐ তীর্থ গুরু শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের নিকট আসিয়া বলিলেন এখন তীর্থ যাত্রীর কোন ভিড় নাই। শ্রী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। আর বিলম্ব করিবেন না। তখনই তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রভু জগদ্বন্ধু দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর মহাজ্যোতি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া মন্দিরের মধ্যে ধরাতলে পড়িলেন। তীর্থ গুরু ও সঙ্গীগণ তাহার এই মহাভাব দর্শন করিয়া

ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন তাহার দেহে যেন প্রাণ নাই। শ্রী মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি যেন শ্রী ভগবানের সহিত অনন্তে মিশিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে হাতের উপর তুলিয়া নিদ্রিষ্ট বাসস্থানে আনয়ন করিলেন। সঙ্গীগণ দেখিলেন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। মন্দিরে শ্রী ভগবানকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার সহিত অনন্তে মিশিয়া গিয়াছেন। সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সারা দিবারাত্র তিনি বিছানায় হত চেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কাহারো আহার নিদ্রা নাই। পরদিন তাঁহার দেহে নাড়ীর একটু স্পন্দন দেখিয়া সকলেই আশাবিত্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে ভগবান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল আজীবন ঐ মহাশক্তির আর পরিনির্বাণ হয় নাই। পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ঐ মহাশক্তি তাঁহার হৃদয়াকাশে চিরকালের জন্য সমুদিত হইয়াছিল। তখন হইতেই তিনি ধর্মের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি সময় সময় বলিতেন পুরীর মন্দিরে তাহার মধ্যে যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই-দিবারাত্রি সমভাবে তাঁহার অন্তরে ঐ মহাশক্তির লীলার কার্য চলিতেছে। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের তীর্থ পর্যটন প্রসঙ্গে আমার দুভাগ্যের কাহিনী একটু উল্লেখ করিতেছি। তীর্থ ভ্রমণের পূর্বে পৌষ উৎসব কালে আমিও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যাইব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। যথাসময় তাঁহার পত্র পাইয়া স্বার্থ বুদ্ধি আমাকে

বিভ্রান্ত করিয়াছিল। তখন ভাবিলাম কয়েক মাস বাড়ীতে না থাকিলে আর্থিক ক্ষতি হইবে সুতরাং এ সময় তীর্থে না যাওয়াই সঙ্গত হইবে। শ্রীগুরুর সনে কথা দিয়া অমান্য করা মহাপাপ এ কথা তখন চিন্তা করিতে পারি নাই। বিমনা হইয়া পত্র লিখিয়া জানাইলাম বাবা তীর্থে গেলে আমার সংসারের অসুবিধা হইবে। আপনি আমার পরিবর্তে অন্য লোক লইয়া তীর্থে গমন করিলে সুখী হইব। তিনি আমার পত্র পাইয়া ২৫ জন সঙ্গী লইয়া যথা সময় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। এক মাস না যাইতেই এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম মহারুদ্র ত্রিশূল হস্তে আমাকে বধ করিবার জন্য আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভয়ঙ্কর রুদ্র মূর্তি। তাঁহার একপদ পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে আর একপদ উত্তর মেরুতে তাঁহার মস্তক দ্বিপ্রহর সূর্যের স্থানে অবস্থিত। এই প্রলয়ঙ্কর রুদ্র মূর্তি দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। মৃত্যুর পূর্বে একবার দয়াময় নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলাম। নাম জপ করিতে পারিলাম না। দেখিতে পাইলাম ঐ রুদ্র মূর্তির চাপে পড়িয়া আমার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া পড়িয়াছে। শরীর চলৎ শক্তিহীন হওয়ায় হাত, পা, মুখ, চক্ষু কিছুই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিতেছিলাম। ঐ ভয়ঙ্কর মহারুদ্র মূর্তি নিকটবর্তী হইলেই মনে মনে ভাবিলাম সব শেষ হইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম রুদ্ররূপী দয়াময় হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন তাহার ভিতর হইতে শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ আবির্ভূত হইয়া তারশ্বরে বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার সঙ্গে তীর্থে যাইবে এই মর্মে কথা দিয়াছিলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর নাই। এই তোমার

প্রথম অপরাধ, এজন্য এবার ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কথা দিয়া অমান্য করিলে জীবন থাকিবেনা।” এই বলিয়া তিনিও মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। তৎক্ষণাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিছানা হইতে সভয়ে উঠিয়া বসিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম শ্রীগুরুই রুদ্র রূপ ধরিয়া আমার অপরাধের জন্য আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীগুরুর অপার মহিমা জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম দয়াময়। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম শ্রীগুরুর আদেশ অমান্য করিয়া মহাপাতকের কাজ করিয়াছি। এই ঘটনার কয়েকদিন পর কর্তা মহারাজ দিল্লী হইতে পত্র লিখিলেন, “স্নেহের কামিনী, ভাবিয়াছিলাম তোমাকে নিয়ে এদেশ ভ্রমণ করিব। তাহা হইলনা- ইহা তাঁহারই ইচ্ছা। তুমি আমার ভ্রমণের জন্য ২৫.০০ টাকা টেলিগ্রাম মানি অর্ডারে দিল্লীর চন্দ্র কুমার দত্তের ঠিকানায় সত্তর পাঠাও। তাঁহার পত্র পাইয়া স্থানীয় আরও কয়েকজন ধর্ম্ম বন্ধু হইতে কিছু টাকা লইয়া ডাক যোগে সব টাকা পাঠাইয়া দিলাম।

তীর্থ পর্যটনের পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ একবার বরকান্তা আনন্দ আশ্রমে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে নৈশ-ভোজনের পর আমরা ৫জন কিছু ধর্ম্ম প্রসঙ্গ শনিবার জন্য তাঁহার বাসগৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি তখন চৌকির উপরে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা কয়জন এখানে আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, আমরা ৫জন আসিয়াছি। আমরা তখন এক বিছানায় উপবেশন করিলাম।

তখন তিনি খুব হাসি মুখে, মনের আনন্দে বৃন্দাবনের কাহিনী, পুরীর বর্ণনা ও অন্যান্য তীর্থের অনেক কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক সাধনার তত্ত্ব কথা তিনি আমাদের কাছে সানন্দে বলিতে লাগিলেন। এমন প্রাণ খোলা অন্তরের সহিত এমন সহাস্য বদনে কথা বলিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। মনে মনে ভাবিলাম তিনি আজ আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া জগদানন্দ হইয়াছেন। দেখিতে পাইলাম তাঁহার আনন্দ উৎস হইতে অমৃত বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এমন স্বর্গীয় সুসংবাদ, এমন অমৃত কাহিনী, এমন অপার্থিব সুসমাচার আমরা জীবনে কখনও শুনি নাই। এমন দেব দুর্লভ অমৃত বাণী কখনও শুনিতে পারিব মনে হয় না। প্রাতঃকালে ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বে তিনি বলিলেন সারা রাত্রিতে যাহা শুনিয়াছ স্মরণ রাখিতে পারিবেনা। তদুত্তরে আমরা বলিলাম সারারাত্রে আশীর্বাদ করিয়া প্রাতঃকালে অভিশাপ দিলেন ইহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। তিনি বলিলেন, এসব কথা তোমরা অন্যের নিকট বলিয়া দিবে, এজন্য স্মরণ রাখিতে পারিবেনা বলিলাম। অনেক আবেদন নিবেদনের পর তিনি বলিলেন সময় সময় এসব কাহিনী কিছু কিছু আমাদের স্মরণে আসিবে। বাস্তবিক সারারাত্রি যে সব অমৃত কাহিনী শুনিয়াছি তাহাই সাধারণ ভাবে তাঁহার পুরী ও বৃন্দাবনের ভ্রমণ কাহিনীতে কিছু উল্লেখ করিয়াছি।

নবম অধ্যায় প্রচার কার্য

বরকান্তা আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ প্রায়ই বরকান্তা আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করিতেন। প্রথমতঃ সাধারণ কয়েকখানা ঘর লইয়াই আশ্রমের কার্য চলিতে থাকে। তিনি বলিতেন, “আমি অনেকদিন যাবত আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী আনন্দের নামে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উপযুক্ত স্থানের তালাস করিতেছিলাম। এখানে ভালস্থান পাইয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এই আশ্রমের নাম বরকান্তা আনন্দ আশ্রম রাখিয়াছি। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ভবিষ্যতে এই আশ্রম সংলগ্ন বহুস্থান লইয়া ইহা একটা বিরাট আশ্রম হইবে। এই আনন্দ আশ্রম দ্বারা ঐশ্বর্য্য ভোগের কামনা শেষ হইবে। এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইলে তিনি বরকান্তা আনন্দ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া এখানেই অনেক দিন থাকিয়া মিশনের কার্য করিতে থাকেন, যতই বেশী দিন তিনি আশ্রমে বাস করিতে ছিলেন ততই লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। এ অঞ্চলে মিশনের সভ্য সংখ্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যতদিন তিনি এই আশ্রমে থাকিতেন নিত্য উৎসবের মত সকল কার্য চলিত। সর্বদাই বহু লোক সমাগম হওয়ায় রোজই নিয়মিত বহু ভাবে আরতি, জপ ও উপাসনা হইত। দিবারাত্রিতে সঙ্গীতও হইত। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই ২/১ জন সঙ্গীতজ্ঞ থাকিত। স্থানীয় কয়েকজন বিখ্যাত গায়কও

রোজই বহু সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন। উৎসবের সময় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সমরেন্দ্র পাল, অমিয় চৌধুরী ও অন্যান্য বহু ওস্তাদের সমাবেশ হইত। সুর শিল্পীদের সুরালাপে শ্রোতৃ মন্ডলী আনন্দে আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ খুব সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। সময় সময় তিনিও গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই সুরসাল সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইতেন। যতদিন তিনি এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন ততদিন আনন্দ আশ্রম আনন্দ মুখর থাকিত। আনন্দময়ের আগমনে সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। দয়াময়ের সেবার জন্য রোজই ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য আহারীয় বস্তু সকল আসিতে থাকিত। এই আশ্রমে থাকিয়া তিনি অনেক যজ্ঞ করিতেন। উপাসনা ঘরে একটি স্থায়ী যজ্ঞ কুন্ডও থাকিত। এ স্থানেই সর্বদা যজ্ঞ হইত। বিপদ, আপদ ও রোগ প্রতিকার কঠিন মনে হইলে তিনি যজ্ঞ দ্বারা এ সব প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন।

যতই তিনি এই আশ্রমে অধিক দিন বাস করিতেছিলেন ততই জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আরও গৃহ নির্মাণ না করিলে অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া তিনি আশ্রমে আরও কয়েকটি ঘর নির্মাণ করিবার জন্য বলিলেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া আমরা উপাসনা ঘর, শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজের বাসগৃহ, অফিস, ভান্ডার ঘর, রান্না ঘর দুইটি এবং অতিথি অভ্যাগত থাকিবার জন্য দুইটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিলাম। আসবাব ও তৈজসপত্রেরও অনেক ব্যবস্থা করা হইল। যাতে আশ্রম স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহার আদেশ লইয়া আমরা সচেষ্ট

হইয়া সর্ব প্রকারের কার্য করিয়াছিলাম। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এসব কার্য পরিচালনা করিতেন। এতেই স্থানীয় আশ্রমের কর্মীগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত যাবতীয় কার্য করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। এইভাবেই আশ্রমের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি যতদিন বরকান্তা আশ্রমে থাকিতেন রাত্রিতে রোজই উপাসনা হইত। কোনদিন প্রাতে, কোনদিন দুপুর বেলায় উপাসনার কার্য চলিত। কখন কখন দুপুর রাত্রে উপাসনা হইত। ইহাতে মহাসাধন উপস্থিত হইত। কখন কখন সারা রাত্রিতে সঙ্গীত হইত। কোনদিন উপাসনাতে বসিয়া তিনি বলিতেন, আজ দয়াময় কল্পতরু হইলেন। এখন তোমরা প্রশ্ন করিলে দয়াময় উত্তর দিবেন। তবে জগতের যোগে প্রশ্ন করিতে হইবে। যিনি যে প্রশ্ন করিতেন মুহূর্তেই তিনি উত্তর দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট পূরণের জন্য জপাদি সাধন দিতেন। এভাবে আরও অনেক প্রকারে তিনি এই আশ্রমে থাকিয়া অনন্ত সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। রোগ শোক ও বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু লোক রোজই আশ্রমে আসিয়া নাম প্রার্থনা করিতেন। সাধনার জন্যও তিনি অনেক নাম দিতেন। আশ্রমে বসিয়া রোজই অনেক লোক সাধনের নিমিত্ত হাজার হাজার নাম জপ করিতেন। আশ্রমে আসিলে সকলকেই সাধন করিতে হইত। তিনি বলিতেন সর্ব ধর্ম মিশন ধর্ম জগতের বিদ্যালয় বিশেষ সুতরাং স্কুল আছে লেখাপড়া নাই, ইহা স্কুল হইতে পারে না। মিশনে আসিলে সাধনের জন্য সব কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কোন দিন মিশনের জন্য জীবন

উৎসর্গ করিয়া কার্য করিতে উপস্থিত মিশন সভ্যগণকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন জীবের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে এবং সাধ্যমত নিশিদিন জগত বাসীর জীবন মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য সাধন করিয়া যাইতে হইবে। যে ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব ধর্ম মিশনের উদ্ভব হইয়াছে সেই ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়াই প্রত্যেকের জন্য শেষ কর্তব্য হইবে। এই মিশনের জন্য যে যত অধিক পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবে তত অধিক তাহার মধ্যে সর্ব নামের সাধনা উপস্থিত হইবে। ইহার নিগূঢ়তম সাধন করিলে উপলব্ধি হইবে। তিনি আরও বলিতেন সার্বজনীন সাধনার প্রতিষ্ঠা কল্পেই মিশনের উৎপত্তি হইয়াছে। মিশনের কার্য করিয়া যাইতে পারিলেই জগতের কার্য করা হইল দেখিতে পাইবে। মনে রাখিবে সর্ব ধর্ম মিশন সাধনও শক্তির উৎস।

তিনি সর্বদাই উপদেশ দিতেন ধর্ম প্রাণ আচার্য্য হইতে নাম গ্রহণ করিয়া সাধন করিবে। তাহার উপদেশ নিয়াই সর্ব ধর্মানুসারে মিশনের নিমিত্ত সাধন করিয়া জীবনের পথ সহজ করিবে। তিনি দৃঢ় ভাবে বলিতেন মিশনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া কার্য করিবে। জগতের সেবা না করিলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায় না। মিশনের সেবাই জগতের সেবা। সর্ব ধর্ম মিশনের সেবা না করিয়া ইহার জন্য সাধন না করিয়া এবং ইহার জন্য স্বার্থ ত্যাগ না করিয়া কেহই জীবন মুক্তি পাইবে না। সুতরাং মিশনের জন্য জীবনপাত করিতে সচেষ্ট হও। মিশনের সেবা না

করিয়া কেহই সিদ্ধ যোগ লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীআনন্দের ধর্মের সকল কার্যই এখন মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। মিশন সেবাই জীবন মুক্তি লাভের প্রকৃত পথ- ইহাই রাজ পথ। এই ভাবেই তিনি সময় সময় মিশন সভ্যগণকে দয়াময়ের কৃপা লাভের প্রকৃত পথের আলোচনা করিতেন।

বরকান্তা আশ্রম ও কমলাপুর আশ্রম একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বরকান্তা আশ্রমে থাকিয়াই তিনি কমলাপুর আশ্রমের কথা চিন্তা করিতেন। বরকান্তা আশ্রম হইতে সময় সময় কমলাপুর যাইয়া মিশন সভ্যদের সঙ্গে আশ্রমের উন্নতির জন্য অনেক আলোচনা করিতেন। তিনি কমলাপুর আশ্রমের আসন ঘর পাকা করিবার জন্য এক প্রস্তাব করেন। কমলাপুর কেন্দ্রের বিশিষ্ট মিশন সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আসন ঘরের কার্য সমাধা করেন। তাঁহার আদেশে এই কেন্দ্রের কতিপয় মিশন সভ্য এই আসন ঘরের ব্যয় ভার বহন করেন। দয়াময়ের মন্দির পাকা হইলে পর একদিন তিনি বরকান্তা আশ্রম হইতে কমলাপুর আশ্রমের মন্দিরে দয়াময়ের আসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। আমরাও কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে ঐ আসন প্রতিষ্ঠার কাজে যোগদান করিবার জন্য কমলাপুর আশ্রমে গিয়াছিলাম। আসন প্রতিষ্ঠার সময় অনেক মিশন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। আনন্দময়ের কার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। আসন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিলেন জগতের অতি শুভ মুহূর্তে আসনের প্রতিষ্ঠার কার্য সমাধা হইল। এরূপ শুভলগ্ন জগতে অতি কম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সর্ব প্রথমে কমলাপুর

আশ্রমের দয়াময়ের মন্দিরই পাকা করেন। পরবর্তীকালে অনেক আশ্রমের মন্দিরই পাকা হইয়াছে।

বরকান্তা আশ্রমে থাকিয়াই তিনি বরকান্তা কেন্দ্র, কমলাপুর কেন্দ্র ও জলম কেন্দ্রে অনেক স্থাবর সম্পত্তি দান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক সময় এখানে থাকিয়াই তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে লোক পাঠাইয়া মিশনের যাবতীয় কার্য করিতেন। আশ্রম সমূহের বার্ষিক উৎসবে তিনি প্রায়ই যোগদান করিতেন। যখন যে উৎসবে উপস্থিত হইতেন সেখানেই আনন্দের মেলা বসিত। যখন যে আশ্রমে তিনি উপস্থিত হইতেন সেই আশ্রমের যাবতীয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। আশ্রমের উন্নতির জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষকে বহু উপদেশ দিতেন। একদিকে মিশনের উন্নতির জন্য অহোরাত্র তিনি অন্তরে যেমন সাধন করিতেন অন্য কার্যের শৃঙ্খলার জন্যও বহু সংগ্রাম করিতেন। প্রত্যেক আশ্রমের কর্মীগণ যাতে উপযুক্ত রূপে গঠিত হইতে পারে তজন্য সকলকেই তিনি শিক্ষা দিতেন। উপযুক্ত কর্মী না হইলে আশ্রমের উন্নতি হইতে পারে না। ইহাই বিশেষভাবে তিনি উপলব্ধি করিতেন। ১৩৩৮ বাংলা সনের ৯ই পৌষ উৎসবে তিনি যে সংকল্প অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :-

(ক) যতদিন জগত থাকিবে ততদিন মিশনের মঙ্গল কামনা করিব।

(খ) মিশনের কর্মচারীদের উন্নতির জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। তাহারা উপযুক্তরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আমি সর্বদা তাহাদের পেছনে আছি।

পরবর্তীকালে এই দৃঢ় সংকল্প লইয়াই তিনি কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হেড অফিসের কর্মচারীদিগের প্রতি তিনি যেমন লক্ষ্য রাখিতেন আশ্রম সমূহের সেক্রেটারীগণকে আশ্রমের উন্নতির জন্য সব শিক্ষা দিতেন। আশ্রম সমূহের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের সব মিশন পরিবার হইতে মুষ্টি চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সামর্থ্যবান মিশন সভ্যগণকে কিছু মাসিক দান দিতে বলিতেন। আশ্রম সমূহের স্থায়ী আয়ের জন্য তিনি অনেক কেন্দ্রেই ফসলের জমি দান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিয়মিত ভাবে সাধন করিবার জন্য তিনি মিশন সভ্যগণকে আরতি করিতে উপদেশ দিতেন। যার জন্য যে নাম ও যে সাধন আবশ্যিক তাহাই দিতেন। গৃহধর্ম পালন ও সস্ত্রীক সাধন করিতে সকল মিশন সভ্যকেই উপদেশ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, জগতে এমন দিন আসিতেছে যে দিনে মানুষ কেবল সাধনের জন্যই জীবন ধারণ করিবে। সর্ব সমাজ সম্পর্কে তিনি বলিতেন সর্ব ধর্ম মিশনের মধ্যে আরও পরে এমন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে যে সমাজের কার্য সাধন ভজন ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। সকল জাতি লইয়া যে সমাজ গঠিত হইবে, সকল ধর্ম লইয়া যে সমাজ কার্য করিবে ও সকল মানুষ লইয়া যে সমাজের জন্ম হইবে সেই সমাজই সর্ব সমাজ হইবে। সেই সমাজের উদ্ধারার্থেই মিশনের জন্ম হইয়াছে। প্রকৃত বিবাহ নিয়া সাধন করা সে সমাজের কার্য হইবে।

দশম অধ্যায় সর্ব ধর্ম বিবাহ কার্য

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তৃতীয় সহধর্মিনীর মৃত্যুর পর দয়াময়ের আদেশ পাইয়া জানিতে পারিলেন দুই জন নারীর মিশনে আগমন হইলেই মিশনের সুদিন উপস্থিত হইবে। তখন তিনি সর্বদাই মিশনের কাজে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। মিশনের সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া অবিরাম সর্ব ধর্ম প্রসারের নিমিত্ত কার্য করিতেন। বাস্তবিক দেখা গেল ১৩৪৭ বাংলা সনে মনোরমা নন্দী ও শৈলজা সেন নামীয় দুইজন ভদ্র মহিলা তাহাদের স্বামীর সংসারের বিপর্যয় অবস্থায় পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া একই সময়ে মিশনের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তাহাদের জীবনের দুরবস্থায় কথা অবগত হইয়া তাহাদিগকে মিশনে আশ্রয় দান করিলেন। তদবধি তাহারা মিশন সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যথারীতি সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তাহারা ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত মিশনে থাকিয়া সর্ব ধর্ম্যানুসারে মিশন সেবা করিতে লাগিলেন। দয়াময়ের অপার করুণা হঠাৎ প্রকাশিত হইল। ১৩৫০ বাংলা সনের ২১ শে আষাঢ় কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্ম আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের উপাসনায় দয়াময়ের আদেশ বাণী প্রকাশিত হইল। নিম্নে উপাসনার মর্ম উদ্ধৃত করা হইল :-

“একটি কার্য উপস্থিত হইল। ইহাতে সাধনের সুবিধা কত রকম হইল ভাবিয়া কেহ স্থির করিতে পারিলনা। অতএব জানাইতেছি

মিশনের শৃঙ্খলা ও জগতবাসীর হিতকল্পে দুইজন মিশনের সভ্য পুরুষ এবং দুইজন মিশনের সভ্য নারীর সর্ব ধর্ম্মানুসারে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। এই জন্য দুইটি বিবাহ দুইভাবে সম্পন্ন হইবে। কারণ সর্ব ধর্ম্মানুসারে যে সমাজ স্থাপন করা হইবে তাহাতে সর্বদার নিমিত্ত তিন প্রকারের অনুষ্ঠান অবস্থা ভেদে করা হইবে। প্রথম প্রকারের অনুষ্ঠান বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য, দ্বিতীয় প্রকারের অনুষ্ঠান সভ্যদের মধ্যে যাহারা সাধনে অগ্রসর, আর তৃতীয় প্রকারের অনুষ্ঠান সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বিহিত হইবে। সুতরাং মাতাপিতার সাধন, মহাকালীর নামের সাধন এবং জীবনমুক্তির সাধন একত্র হওয়াতে আজ উক্ত ব্যবস্থা উপস্থিত হইল। পৃথিবীতে আর কেহ সমাজ নিয়া চলিতে পারিবে না। এখন সর্ব সমাজের কার্য নিয়াই সকলে কার্য করিতে অগ্রসর হইল। এই সমাজ চিরদিনের নিমিত্তই আবির্ভূত হইল। জগতের জনগণ সর্বতোভাবে কার্য করিতে পারে এরূপ অধিকার আরও কয়েক বৎসর পরে সর্ব সমাজ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিতে পারা যায় যে মিশনের লোকজন অন্ততঃ দুই তিন হাজার হইলে সমাজ ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্যে সর্ব সমাজ গড়িয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব বিশেষ কথা এই যে মিশনের ব্রত যাহারা গ্রহণ করিবে তাহারাই অগ্রে বিবাহ সূত্রে প্রথিত হইয়া সর্ব সমাজ নিয়া অগ্রসর হইবে। সুতরাং মিশন বাড়ীর নিমিত্তই এখন এই বিধান আসিল যে এই বাড়ীতে যাহারা বাস করিতেছে তাহারাই উক্ত নিয়ম মানিয়া কার্য করিবে, নচেৎ কেহই মিশন বাড়ীতে মিশনের আশ্রয়ে থাকিতে পারিবে না। মিশন চাহিলে স্বেচ্ছায় মিশন

উদ্ধারার্থে সর্ব ধর্ম্মানুসারে বিবাহ প্রথার প্রচলন এখন অবশ্যই করিতে হইবে। এক নারী সম্পর্কে কথা আসিল। ইহা এই যে শ্রী মতি মনোরমা নামে যে ব্যক্তি মিশনে বাস করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে সেও মিশনের কোন সভ্যের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবে নতুবা তাহার সংগ্রাম অসংখ্য প্রকারে বর্দ্ধিত হইবে। কে তাহার পতি হইবে ইহা সে নিজে মীমাংসা করিবে। স্বেচ্ছায় যাহাকে সে বরণ করিবে তাহাকে নিয়াই সে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবে। তাহার মনোনীত বর তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে সর্ব ধর্ম্মানুসারে সে পতিত হইবে এবং মিশনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারিবে না। এজন্য বলিতেছি এখন হইতে আরও অনুরূপ ঘটনা অনেক হইবে। এভাবেই সর্ব সমাজের কার্য প্রসার লাভ করিবে। অতএব একটি কার্যের দ্বারাই এই মহিলার সাধন সিদ্ধ যোগে চলিতে পারে অর্থাৎ এখন হইতে কেবল মিশন লইয়াই এই ব্যক্তি চিরকাল সাধন করিবে এবং ইহার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিবে অন্যথা সর্বনাশ হইবে। অতএব নিম্নলিখিত নিয়মে মনোরমার বিবাহের ব্যবস্থা হইবে।

সর্ব ধর্ম্ম বিবাহ - ১নং

প্রেসিডেন্ট-শ্রীলব চন্দ্র পাল ও শ্রীমতি মনোরমার বিবাহ

২৫শে আষাঢ় - শনিবার

রাত্রি ১১টা-১টা

স্থান- মিশন বাড়ী, কৃষ্ণনগর

উপাসনা গৃহ

১৩৫০ বাংলা সন - আনন্দাব্দ-১১২

পরমেশ্বর পরমানন্দ ভগবান দয়াময় সর্ব প্রতিকার নামেতে দিয়া
আর্শীবাদ করিলেন। সর্ব জগতের আয়োজনে উভয়ের পরিণয়
ব্যাপার নিয়া অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হউক।

(ক) উদ্বোধন সঙ্গীত-

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে.....

সর্ব ধর্ম গীত-২য় ভাগ

(খ) উপাসনা-

সঙ্গীত- তুমি আমার আমি তোমার এই কথা সার.....

সর্ব ধর্ম গীত-২য় ভাগ

(গ) কন্যা বলিবে-

আমি শ্রী মনোরমা নন্দী বিবাহিতা, কিন্তু স্বামী কর্তৃক
পরিত্যক্তা হইয়াও অনিবার্য কারণে তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন
করিয়া অশেষ অশান্তি ভোগ করিয়া দয়াময়ের কৃপায় সর্ব ধর্মের
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও পরম শান্তি
প্রাপ্ত হইয়াছি।

বর বলিবে-

আমি শ্রীলব চন্দ্র পাল সর্ব ধর্ম আশ্রয়ে বহু কাল যাবত সাধন
ভজন করিয়া জীবন মুক্তির পথে দন্ডায়মান হইয়া সর্ব ধর্ম মিশন
প্রতিষ্ঠার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। সঙ্গীত-দয়াল নামের
মহিমারে পৃথিবীতে হইল প্রচার।

সর্ব ধর্ম গীত - ১ম ভাগ

(ঘ) কন্যা বলিবে-

আমি শ্রী মনোরমা নন্দী অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত এবং
কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্ম আশ্রমের ২১/৩/৫০ বাংলা মঙ্গলবারের বার্ষিক
উৎসবের উপাসনায় প্রকাশিত দয়াময় আদেশ অনুসারেই স্বেচ্ছায়
ও স্বজ্ঞানে এই সম্মুখস্থ শ্রীযুক্ত লব চন্দ্র পাল মহাশয়কে পতিত্বে
বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা সহায় হউন।

বর বলিবে-

আমি শ্রীলব চন্দ্র পাল অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই প্রতিজ্ঞা
করিতেছি যে, আমি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্ম
আশ্রমের ২১/৩/৫০ বাংলা মঙ্গলবারের বার্ষিক উৎসবের
উপাসনায় প্রকাশিত দয়াময়ের আদেশানুসারেই এই সম্মুখস্থ
শ্রীমতি মনোরমা নন্দীকে পত্নীত্বে বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা
সহায় হউন।

(ঙ) কন্যা বলিবে-

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা
তোমার হউক। আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। দয়াময়
পূর্ণ পরাৎপর ভূবন বিখ্যাত সিদ্ধযোগে আমাদিগকে গ্রহণ করুন।
বর বলিবে-

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হৃদক, আমার যে হৃদয় তাহা
তোমার হৃদক। আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হৃদক। দয়াময়
পূর্ণ পরাৎপর ভূবন বিখ্যাত সিদ্ধযোগে আমাদেরকে গ্রহণ করুন।

(চ) ইহার পর মালা বদল করিয়া প্রার্থনা-

দয়াময় অদ্য তুমি রাজ্য কর হৃদয়ে এই মাত্র সান্তনা
আমাদের মনে প্রদান করিয়া উভয় মিলন কার্য সম্পন্ন কর।

ধ্যান- সর্ব প্রতিমা জয় দয়াময়।

নমঃ জয় গুরু দয়াময়।

বর ও কন্যা পরস্পরকে নমস্কার।

সঙ্গীত- ভীম গজর্জনে উঠিল গগনে

১ম ভাগ সর্ব ধর্ম গীত।

জয় ধ্বনি

আচার্য- শ্রীপ্রসন্ন কুমার পাল বি,এ

সেক্রেটারী সর্ব ধর্ম মিশন

সর্ব ধর্ম বিবাহ - ২নং

শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতি শৈলজা সুন্দরী সেন

উভয়ের বিবাহ।

তাং- ২রা আষাঢ় সোমবার

রাত্রিঃ ৮টা - ৯টা

স্থান- উপাসনা গৃহ, মিশন বাড়ী, কৃষ্ণনগর

১৩৫০ বাংলা সন

১। সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর দয়াময় সর্ব ধর্ম মিশন
প্রতিষ্ঠাকল্পেই আশীর্বাদ করিলেন। উভয়ের বিবাহ কার্য
সুসম্পন্ন হউক।

২। উদ্বোধন সঙ্গীত-

হরির নামেতে অমৃত বর্ষণ হল জগতে

সর্ব ধর্ম গীত-২য় ভাগ

৩। উপাসনা-

গীত-মনের কামনা সিদ্ধকর দয়াময় নামেতে

সর্ব ধর্ম গীত-২য় ভাগ

৪। কন্যা বলিবে-

আমি শ্রীশৈলজা সুন্দরী সেন বিবাহিতা কিন্তু স্বামী কর্তৃক নিগৃহীতা
ও পরিত্যক্তা হইয়া এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য
হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় দয়াময়ের কৃপায় সর্ব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

বর বলিবে-

আমি শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সর্ব ধর্মের আশ্রয়ে বহুকাল যাবত
সাধন ভজন করিয়া প্রকৃত শান্তির পথে দভায়মান হইতে
পারিয়াছি এবং সর্ব ধর্ম মিশনের সেবায় জীবন উৎসর্গ
করিয়াছি।

সঙ্গীত- অধম তারণ বিপদ ভঞ্জন জ্ঞানময় হরি

মাধব হে

সর্ব ধর্ম গীত-১ম ভাগ

৫। কন্যা বলিবে-

আমি শ্রীশৈলজা সুন্দরী সেন অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত এবং দয়াময়ের আদেশেই স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এই সম্মুখস্থ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে পতিত্বে বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা আমাদের সহায় হউন।

বর বলিবে-

আমি শ্রী খগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অদ্য ঈশ্বর দয়াময় সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি দয়াময়ের আদেশানুসারেই স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আমার সম্মুখস্থ শ্রীশৈলজা সুন্দরী সেনকে পত্নীত্বে বরণ করিলাম। দয়াময় পিতা আমাদের সহায় হউন।

৬। কন্যা বলিবে-

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। দয়াময় পূর্ণ পরাৎপর ভুবন বিখ্যাত সিদ্ধ যোগে আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

বর বলিবে-

তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। দয়াময় পূর্ণ পরাৎপর ভুবন বিখ্যাত সিদ্ধ যোগে আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

৭। ইহার পর মালা বদল করিয়া প্রার্থনা-

দয়াময় অদ্য তুমি রাজ্য কর হৃদয়ে এই মাত্র সাক্ষ্যনা আমাদের মনে প্রদান করিয়া উভয় মিলন কার্য্য সম্পন্ন কর।

জপ- সর্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়

বর-৮০০ জপ

কন্যা-৮০০ জপ

নমঃ সর্ব ধর্ম মিশন দয়াময়-

পরে বর কন্যা পরস্পরকে নমস্কার করিবে

সঙ্গীত-এল শেষ দিন, নর নারীগণ

পাবে পরিত্রাণ বল দয়াময়-

সর্ব ধর্ম গীত-১ম ভাগ

৮। আচার্য্যের উপদেশ-

প্রকৃত তত্ত্ব- ক) স্ত্রী ছাড়া সাধনের অর্দ্ধ যোগ

খ) প্রকৃত বিবাহ

গ) সাধন ও ব্যবস্থার সম্বন্ধে উপদেশ-

-জয়ধ্বনি-

আচার্য্য- শ্রীলব চন্দ্র পাল

প্রেসিডেন্ট-সর্ব ধর্ম মিশন

একাদশ অধ্যায় সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্ত বিশেষ লোক একজন আসিবেন

জগতের ধর্ম সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যে সকল অবতার ও অবতীর্ণ ও প্রেরিত বা সাধু পুরুষের ভাব কার্য্য করিতেছে তাদের কোন ব্যক্তিকেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। তাঁহারা সকলেই সময়ানুসারে আগমন করিয়া জগতের উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যের ভাব পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। কিন্তু একতার ভাব অভ্যন্তরে আছে। এই একতার ভাব তাঁহাদের লিখিত ধর্ম গ্রন্থ হইতে প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য জনৈক প্রশস্তমনা আচার্য্যের আবশ্যক। এমন দিন নিকট হইয়াছে যে দিন সর্ব ধর্ম সামঞ্জস্য ও সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য একজন আসিবেন, তাঁহার কথা জগত শুনিবে ও একতার পূর্ণ যোগ লাভ করিয়া জীবন-মুক্তির সোপানে আরোহন করিবে।

-প্রকৃত তত্ত্ব।

“প্রকৃত তত্ত্বে” বর্ণিত বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে দয়াময়ের বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল-

মহাপুরুষ মুহাম্মদ জানিতেন তিনি যে ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে এ জন্য ভবিষ্যতে এক বিশেষ লোক জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি জগতকে এক ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। তিনিই পরে এমাম মেহেদী নামে আখ্যাত হইবেন। প্রেরিত পুরুষ আরও জানিতেন এই মেহেদীর জীবনে কোন

নির্দিষ্ট ধর্ম মত কার্য্য করিবে না। সকল ধর্মের পার্থক্য বিদূরিত করিতে তিনি আসিবেন।

ভগবান বুদ্ধেরও উক্তি আছে এক সময়ে মৈত্রেয় জগতের মধ্যে সভ্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এজন্য আসিয়া ধর্ম চক্র প্রবর্তন করিবেন। তিনি পরম উদার ভাবে প্রচার করিয়া জগতের কল্যাণ ও ঐক্য বিধান করিবেন।

ভগবান যীশু খৃষ্টেরও উক্তি আছে পৃথিবীতে এক সময় স্বর্গ রাজ্য প্রকাশিত হইবে। তখন ধরনী তলে পুণ্যাত্মারা শান্তির পরমানন্দ ভোগ করিবে।

সুতরাং পৃথিবীর ভাগ্যে শেষে এক অপূর্ব শুভ যোগ রহিয়াছে, একথা অনেক ধর্মেই শুনিতে পাওয়া যায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীন ঐক্য যোগ দিয়া জগত প্রেমে সংবদ্ধ হইবে ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিলেও এই কথার সাক্ষ্য সকলেই দিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যেমন জাতিগত পার্থক্য দূর না হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প তেমন ধর্মগত কিংবা নামগত বৈষম্য দূর না হইলে মনুষ্য মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় হইতে পারে না। শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে মূলতঃ সকল বস্তুই এক এবং প্রত্যেকেই সর্ব তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। সুতরাং ধর্মগত পার্থক্য দূর হইয়া জগতে একতা হইবে ইহা মিথ্যা নহে। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজে ভিন্ন ভিন্ন পথে হাঁটিয়া পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া ছিলেন। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে সকল পথেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যকেই ঈশ্বর তাঁহার

উপাসনা বা সাধন প্রণালী শিক্ষা দিবেন। এজন্য সময় হইলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছাতে অবতারণা করিত বা মহাপুরুষদের জন্ম হইয়া থাকে। আদর্শ মহাত্মাদের কার্য্য প্রণালী ও প্রচার প্রণালী পৃথক পৃথক মনে হইলেও আলোচনার দ্বারা সম্যক উপলব্ধি হইবে যে সমুদয় ধর্মের অভ্যন্তরেই এক আশ্চর্য্যজনক ঐক্য বিরাজমান রহিয়াছে। এই একতার কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং সকলকে সাধন দ্বারা প্রেম সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য একজন উন্নতমনা মহাপুরুষ আসিবেন। তাহার কথা ও উপদেশ মানিতে দ্বিধাবোধ করিবে না; বরং আনন্দে জ্ঞানের উল্লাসে সকলেই এই মহাত্মাকে অনুসরণ করিয়া ধন্য হইবে।

শ্রী আনন্দ বলিতেন, প্রচার করিয়াও গিয়াছেন তাহার ধর্ম্মে শমন ভয় দূরে যাইবে-মর্ত্তে অমরত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। এ জগতের সকলেই ইহ পরলোক অতিক্রম করিয়া পূর্ণ মনোরম হইবে। এই জন্য তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধ জীবন লাভ করিয়া এই ধরণীতে আবার সকলের সমক্ষে আবির্ভূত হইবেন ও জগতকে একতার বন্ধনে গ্রথিত করিবেন। তবে ইহা সুনিশ্চয় যে তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন- যে ধর্ম্মে ইহ পরলোকের সকলে যোগদান করিতে পারিবে সেই ধর্ম্মে উন্নতির নিমিত্তে অবশ্যই এক মহামনা কোন এক বিশেষ ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে-যাহার জীবন ব্যাপী সাধনাতে সর্ব্ব ধর্ম্মে প্রচার পথ উন্মুক্ত হইবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন যোগ লাভের নিমিত্তে এবং তিনি এই ধর্ম্মের বিস্তারার্থে এক নূতন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনিই সেই বিশেষ ব্যক্তি যাহার দেহ

ও আত্মাতে সর্ব্ব ভৌমিক সত্যের বিকাশ হইবে-যাহার মধ্যে সেই বরেন্য পুরুষ স্বামিজী মহারাজের সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য স্বরূপে ফল প্রসব করিবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বামিজীকে আদর্শ মানিয়া চলিবেন-তাঁহার সহিত যোগে কার্য্য করিবেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহারই প্রণতঃ শিষ্যরূপে আদর্শ ভক্তভাবে কার্য্য করিয়া মণ্ডলী গঠনে নিযুক্ত হইবেন।

সুতরাং এক্ষণে আমরা শ্রী আনন্দের নির্দেশিত জগৎ বরণ্যে মহাপুরুষ কে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি আরও বলিয়াছেন-সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যিনি আসিবেন অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রকাশ হইবে।

দয়াময়ের প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ১৩২৬ বাংলা সনের ৫ই পৌষ ইহ পরলোক বাসীর মুক্তির জন্য এক বিশাল ধর্ম্ম সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্ম সঙ্গের প্রতিষ্ঠা কালে বহু অবতার ও মহা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই এই ধর্ম্ম মণ্ডলী বা সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনকে বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। ইহা আমরা সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের প্রতিষ্ঠার উপাসনা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারি। মিশন প্রতিষ্ঠার কালে যে সকল মহাপুরুষ উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে ‘দয়াময়’ নামই জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন সেবাই ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র পথ এই মিশন সেবা না করিয়া কেহই সর্ব্ব নামেতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেনা।

১৩৫৪ বাংলা সনের বরকান্তা আনন্দ আশ্রম বার্ষিক উৎসব উপাসনায় দয়াময় বলিয়াছেন সর্ব ধর্ম মিশন চিরদিন ৩টি আদর্শ নিয়া কার্য করিবে।

- ১। সকল ধর্ম সিদ্ধ যোগে মিলিত হইয়া কার্য করিয়া যাইতে পারে তজ্জন্য মিশন কার্য করিবে।
- ২। পৃথিবীতে জাতিগত অনৈক্য না থাকে ইহাই কার্য ক্ষেত্রে একমাত্র মিশনের উদ্দেশ্য হইবে।
- ৩। ইহ পরলোক সর্বত্র “দয়াময়” নামই একমাত্র জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ-এই বার্তাই মিশন চিরকাল প্রচার করিবে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যেমন যীশুর ধর্ম মত জগতে প্রচার করিয়া ছিলেন পিতর ও পল, হযরত মুহাম্মদের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন মহামনা আবুবকর গৌতম বুদ্ধের সত্য প্রচার করিয়াছিলেন আনন্দ ও সারিপুত্র, চৈতন্য মহা প্রভুর ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু তেমনি শ্রী আনন্দের ধর্মমত জীবনাবধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সর্ব ধর্ম মিশনের মাধ্যমে। ইহ পরলোক লইয়া মিশনের কার্য ছিল তাঁহার আজীবন সাধনা। যতই দিন যাইবে ততই জগত মিশনের সত্য বুঝিতে পারিবে। মিশনের পরিচালনা স্বয়ং দয়াময় করিতেছেন। দয়াময়ের আদেশেই তিনি মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন বাহিরের চাপে কোন দিন মিশন বিনষ্ট হইতে পারে না-মিশনের কার্য বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। দয়াময় নামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হইল। দয়াময় জগতের নিয়ন্তা হিসাবে মিশনের কার্যভার গ্রহণে সকলের চিন্তা বিদূরিত

করিলেন। আজ মিশনের মধ্যে সর্ব প্রকারে অর্থবল সিদ্ধ হইয়াছে। দয়াময় এখন মিশনের কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং যখন যাহা আবশ্যক হয় নিজেই আনিয়া উপস্থিত করিবেন। অতএব জগতের মধ্যে মিশনের কার্য সর্ব প্রকারে উদ্ধার করিলেন। শান্তি সাধন ও সমাজ এই তিনটি বিষয়ই সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া মিশন কার্য করিবে।

সর্ব ধর্ম সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি যে অভিমত লইয়া কার্য করিতেন এ সম্পর্কে তাঁহার উক্তি প্রদত্ত হইলঃ-

হিন্দুরা তাহাদের গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কিংবা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থের উপদেশ বলিয়া জানাইয়া থাকেন যে বেদের উক্তিই সত্য-বেদোক্ত মতই শ্রেষ্ঠ মত। খৃষ্টিয়ানরা ও বাইবেলের ছত্রে জীবনের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব পন্থী মহাশয়েরা অবতারাদি ধর্ম প্রবর্তকের শ্রীগ্রন্থ পড়িয়া অনেকে প্রেম সম্পর্কে বাদানুবাদ করিতেছেন। যার রুচি বা আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি যেমন-তার জন্য তদনুরূপ পথই সর্বতোভাবে প্রশস্ত। দেশে অনেক সম্প্রদায় রহিয়াছে নানা ধর্মমন্ডলী নানা জায়গায় কার্য করিতেছে। প্রতি ধর্ম মত জগতের কল্যাণোদ্দেশ্যেই কার্য করিতেছে। সুতরাং কোন ধর্ম ভাল কোন ধর্ম মন্দ এই রূপ প্রশ্ন করা শুধু অর্বাচীনতা বা অজ্ঞানতা বই কিছুই নহে। অতএব মনে রাখিবে মানুষের প্রবৃত্তি ভেদে ধর্ম। যিনি যে পথে গমন করিয়া ঈশ্বরে পৌঁছিয়াছেন তিনি সে পথের বার্তাই পৃথিবীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা মানুষের স্বভাব জীবেরই প্রকৃতি। কিন্তু চক্ষুস্মান ব্যক্তি জানেন-প্রয়োজন হইলেই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে

কোন একটি ধর্ম পথ বাহির হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থে বা সাম্প্রদায়িকতার হিসাবে কোন ধর্মই এ পর্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। এই সম্বন্ধে ভগবান চৈতন্যদেবের উক্তি আছেঃ-

অনেক লোকের রুচি অনেক প্রকার

তাহাতে অনেক পথ হইলো প্রচার।

এই জন্য সকল ধর্মই সমান প্রয়োজনীয়। ভাল মন্দ এই রূপ বলা কখনও যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না।

উন্নতির অবস্থা লাভ করিলে এবং সাধনার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহন করিলে দেখিবে একজন ভিন্ন দুই জন কর্তা নাই। এক ভিন্ন দুই তত্ত্ব নাই। ছাদে পৌঁছবার জন্য নানা রকম সিড়িই আছে এই মাত্র। এজন্য প্রতি ধর্ম নিয়া তাহার উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব প্রণালী বরং জানিতে চেষ্টা করিবে। উহা যাতে বিশুদ্ধ ভাবে প্রচারিত হয় তাহার জন্য আশ্রয় যত্ন করিবে। পৃথিবীতে যত ধর্ম মত প্রচলিত রহিয়াছে প্রত্যেকটি ধর্ম মত এক সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে ঈশ্বর উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিতেছেন। সকল ভাই ভগিনীর একতায় যে পরিবার সুখ সম্পদে পূর্ণ হইয়া যায় সকল ধর্মের একতা দ্বারাও তেমন সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিতে পারে সন্দেহ নাই। সাধনার হিসাবে সুস্ব দৃষ্টি থাকিলে তত্ত্বের হিসাবে সকল ধর্ম নিয়া সমালোচনা করিতে পারিলে এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন সকল বস্তুই এক বলিয়া ধারণা জন্মিলে কেহই আর ধর্মের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে পারেন না।

শ্রীশ্রী পরমহংসদেব নিজে অসামান্য যোগবল নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার দিব্য দৃষ্টির নিকটে সকল ধর্মের সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তিনি অসীম সাধনার শেষ বাণী পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন-

“যত মত তত পথ”

কেবল উপরে উঠিলে সিড়ির পর সিড়ি পার হইয়া ছাদে পৌঁছিতে পারিলে এ সমস্ত খুটি নাটি আর থাকিবে না। কেবল বলিতে থাকিবে-

যৎ ভূমা তৎ সুখং

নাশ্লে সুখং অস্তি।

সুতরাং সত্যের জন্য সাধন কর এবং শেষ ভূমি না পাওয়া পর্যন্ত নীরবে অবিশ্রাম গতিতে চলিতে থাক দেখিবে কখনও ঈশা, মুশা, কবির, নানক, শিব, চৈতন্য, বুদ্ধ কিংবা জোরতোস্ত প্রভৃতি জগতের সর্বোচ্চ মহাপুরুষেরা একত্রে মিলিত হইলে বিন্দু মাত্র বিরোধ করিবে না, পক্ষান্তরে সকলের সহিত সকলে মিলিয়া ধরিত্রীর জরা মৃত্যুর নানা ভূমিতে অনিন্দ সুন্দর স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাই আজ বলিতেছি ধর্মের নিন্দা করিও না, পারিলে সকল ধর্মের সার সত্যের সাধনে জীবন উৎসর্গ কর এবং জগতের সেবায় প্রত্যেক ধর্ম মতের প্রচার কিংবা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কার্যে ব্রতী হও। ইহাই সনাতন নীতি-ইহাই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সাধনার বিধি।

এ ছাড়া আরও একটি কথা রহিয়াছে-তাহা এই যে জ্ঞানই মুক্তি এই কথা বেদান্ত উপদেশ করেন। সাংখ্য বাদ প্রকৃতি এবং পুরুষ

লইয়াই সাধন শেষ করিতে পারা যায় এরূপ নির্দেশ করেন। প্রেম অথবা পঞ্চম পুরুষার্থই জীবনের সর্বোচ্চ ভূমি ইহা শ্রীমমহাপ্রভুর প্রচারিত সত্য রহিয়াছেন। যোগবল কিংবা প্রাণায়াম প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ইহা যোগে শাস্ত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন। আগম শাস্ত্রে আছে মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারাও কার্য্য হাসিল হইতে পারে। সুতরাং ধর্ম লাভের জন্য অনেক পথ আছে-অনন্ত উপায় রহিয়াছে। এ জন্য কোন ধর্ম কেই উপেক্ষা করা যায় না।

একজন ধর্ম প্রবর্তক আসেন জগতের উপকার সাধন করিতে-ধর্ম স্থাপন করিতে-এবং জগতের ধর্ম বিপ্লব বিনাশ করিতে। যখন যেরূপ কার্য্য ধারা প্রয়োজনীয় হয় কিম্বা যে স্থানে যে নিয়মে কার্য্য করা আবশ্যক থাকে তাহারা সেভাবেই কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই এক অনন্ত ঈশ্বরের অখন্ড চিদানন্দ সমুদ্রের বিকাশ ইহা নিশ্চিত কথা। যিনি স্রষ্টা, বিশ্ব নিয়ন্তা তাঁহার শক্তিই সকলের মধ্যে কার্য্য করিতেছে।

জগত অবিরাম গতিতে চলিতেছে। যেমন একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থের নানা অধ্যায় থাকে-প্রতি অধ্যায়ে আবার নানা বিষয় থাকে তেমন সৃষ্টির স্তরে স্তরেও মহম্বর আছে যুগ আছে কত রকম কালের বিভাগ আছে। গ্রন্থে যে এক অধ্যায়ের সহিত অন্য অধ্যায়ের মিল আছে-সৃষ্টি রহস্যের ভিতর দিয়াও তদ্রূপ যোগ সূত্র আছে। সত্য যুগের জীবনচিত্র কলিযুগে পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার তথাপি সত্য যুগের পরিণতিই কলিকাল। এ জন্যই যুগানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ঈশা, হজরত আদম ও হজরত

ইলায়া, কালী ও শিব, দুর্গা ও রাধা কৃষ্ণ ও চৈতন্য, বোধিসত্ত্ব ও শঙ্করাচার্য্য, জোর তোস্ত ও লাউজির জীবনে কার্য্য ও কথায় বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক কথা এই যে এক ঈশ্বরই সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন- গোড়ায় বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সৃষ্টির লক্ষ্য সূত্র বজায় রাখিয়া লীলা বৈচিত্র্য বিধান কল্পে প্রয়োজনানুসারে দেশ কাল পাত্র ভেদে একজন ধর্ম প্রবর্তক উপস্থিত করিয়া থাকেন।”

-সর্ব ধর্মের সার কথা।

তারপর আমরা দেখিতে পাই জগতে মহাপুরুষগণ যে সকল ধর্ম গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যের ভাব পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে যে একতার ভাব আছে তাহা শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বিশদ ভাবে জন সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার উক্তি কিছু প্রদত্ত হইলঃ-

কোরানে আছে, “লাইলাহা ইল্লালাহ মুহম্মদের রাসূলুল্লাহে” অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভূত। শতসহস্র নরনারী মহাম্মদের আদেশ মান্যকরে তাঁহার পথ অনুসরণ করে, তাঁহার দর্শন হইলে মানুষ মুক্ত হয়।

ঈশা বলিতেন, “In him we live move and have our being”, আবার ইহাও বলিতেন, “আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং

আমি এক।” তিনি বলিতেন, “হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইক।” তিনি সত্যই মহাপুরুষ।

কনফুস চীনের দেবতা। ঐ দেশে সর্ব বিষয়ে তাঁহার তুল্য আর নাই। ঘরে ঘরে স্থলে স্থলে তাঁহার নামে সকলে মন্তক অবনত করে। স্কুলে গিয়া পরিদর্শক কন-ফুসের স্মৃতি প্রস্তর ফলকের সম্মুখে প্রণিপাত ও প্রার্থনা করে-“হে সিদ্ধ পুরুষ, তুমি মহান, তুমি সকল গুণের আধার। তোমার শিক্ষা নির্দোষ, মনুষ্য লোকে তোমার তুল্য কেহ নাই-রাজগণ তোমাকে মান্য করিয়া আসিতেছেন,-এই কলেজে তুমিই আদর্শ দেবতা-ভক্তিভাবে পূজোপহার প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

আত্ম শাসন, পরিবার শাসন, অচলা রাজভক্তি, গৃহশান্তি, সমাজ শৃঙ্খলা, রাজ্যরক্ষণ ও রাজ্যোন্নতি এই কয়েকটি সত্যই কনফুস প্রবর্তিত মতের ভিত্তি।

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে শাক্য সিংহ নামে এক রাজপুত্র জন্মিয়া ছিলেন। শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মে তিনি সংসারে অতুল্য ছিলেন। ঐশ্বর্য্যে-সুখে তাঁহার জীবন মরলোকে ধন্য ছিল। তিনি সংসার ছাড়িয়া দিলেন-জগতবাসীর কল্যাণ করিবেন বলিয়া। যোগ, তপস্যা, কঠোর সন্ন্যাসে ও তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং শেষে নিরঞ্জন নদীর তীরে জীবন মরণ পণ করিয়া বলিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন-

ইহা সনে শুশ্যতুমে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঙ্ক যাতু

অপ্রাপ্য বোধি বহুকল্প দুর্লভাৎ
নৈবাসনাৎ কাময়ত শলিষ্যাত।

বিশ্বগ্রাসী ধ্যান তাঁহার জীবন সফল করিল। তিনি জ্ঞানোন্মত্ত হইলেন-অমর হইলেন। এরূপ জ্ঞান পিপাসা, এবম্বিধ প্রযত্ন সর্বার্থ সিদ্ধির উপমা সন্দেহ কি? বুদ্ধ নূতন ধর্মে জগত পবিত্র করিলেন। মানুষ নির্বান লাভ করে, চিন্তার প্রভাবে বাসনার পরপারে উঠিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

আর একজন মহাপুরুষ পারস্য দেশে জন্মিয়া ছিলেন। তাহার পুণ্য স্মৃতি আজও পারসি সমাজে জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার নাম “জোর তোস্ত।” খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মের নাম “জেন্দাবস্তা”। একেশ্বরবাদ তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ঈশ্বর ‘অহরমজদ’ পাতা-সুখদাতা জ্ঞান স্বরূপ জ্যোতির জ্যোতিঃ তিনি। মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার ইচ্ছা প্রসূত। জোর তোস্ত উপদেশ করিয়াছেন “কায়মনোবাক্যে আত্ম শুদ্ধি রক্ষা কর।” এ মহাপুরুষ পারসীদের অবতার।

তোমরা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়াছ। তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। তিনি বত্রিশ বৎসর কাল পৃথিবীতে ছিলেন। আট বৎসর বয়সেই তিনি বড় সংস্কৃত গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত লেখা অতি প্রাজ্ঞল, গভীর ভাব ব্যঞ্জক। তাঁহার শ্লোক আছে-

মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বম্

কেমন সুন্দর উপদেশ। কত সত্য কথা। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে জ্ঞানী মাঝেই এক বাক্যে মস্তক অবনত করে। এত শক্তি তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন? কি অমানুষী প্রতিভা বলে এত অল্প বয়সে এত কর্ম করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন? তিনি উপদেশ করিয়াছেন-“মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।” যাহারা জগতে বড় লোক তাহাদের সকলেই বীর্যধারণে নিরত ছিলেন।

আর একজন বড় লোকের কথা মনে পড়েছে। তিনি শিক্ষায় প্রবীন, স্মৃতিতে অজয় সর্বদা তিনি কীর্তন করতেন। জগত তাহার পূজা করে, তাঁহার মধুর প্রেমে পাষণ্ড দ্রব হয়। হিংস্র ব্যাঘ্র, বন্য হস্তী হরিবল হরিবল ধ্বনিতে নিবিড় অরণ্য মুখরিত করিত। তিনি বাংলার মানুষ। পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধামে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মর্ত্য লোকে আগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলেই আদর করিয়া নিমাই বলিয়া ডাকিত। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। ইহাকে প্রেমের ধর্ম বলে। তিনি জগতে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে পরিচিত। মহাসাগরেরও সীমা আছে, চৈতন্য হৃদয়ের সীমা নাই। কথায়, ব্যবহারে, দেহে, বিদ্যায়, দয়ায়, পাষণ্ড, দলনে, নৃত্যে, নিষ্ঠায়, পুরুষ ভাবে, স্ত্রী ভাবে, লীলায়, নৃত্যে, আনন্দে, মধুরতায়, বিনয়ে কত সুন্দর কি বলিব?

শ্রীচৈতন্য বলিতেন সমাজে পঞ্চ প্রকার প্রেমের ভাব মানুষকে অতিদূরে ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন সকলেই সকলকে স্বার্থ শূন্য ভাবে ভালবাসিবে। ঈশ্বর সকলের মাতা পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র-কন্যা এবং পতি-পত্নী মনে করিয়া পৃথিবী আনন্দ মেলায় পরিণত হইবে। তাঁহার উপদেশ কত উচ্চ।

তোমরা আর একজন বড় লোকের নাম শুনিয়াছ। তাঁহার নামে হৃদয় নাচিয়া উঠে। তিনি কলেজের ছাত্র, বি, এ পাশ করিয়াছিলেন। সংসার তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই। একজন অবতার তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাবলে, শক্তি সঞ্চারণে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার নাম বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন প্রাচ্যের ধর্ম ও প্রতীচ্যের কর্ম একত্র হইলেই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে।

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে একজন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সফ্রেটিস। সকলে তাঁহাকে জ্ঞানীর জ্ঞানী বলিয়া জানিত। তাহার জ্ঞানবত্তার কথা কেহ বলিলে তিনি শিশুর মত উত্তর দিতেন আমি জানি আমি কিছুই জানি না। সফ্রেটিস প্রচার করিতেন উপদেশ দিতেন-আত্মার মরণ নাই। শরীর বিনষ্ট হইলেও আমরা যাহা ছিলাম তাহাই থাকিব। তৎকালে গ্রীসের প্রচলিত ধর্মমত অন্যমত অন্য রূপ ছিল। এজন্য দেশ-বাসী,দেশের রাজা আদেশ করিলেন, “তুমি ধর্ম বিদ্বেষী, রাজদণ্ড স্বরূপ তোমাকে স্বহস্তে বিষ পান করিয়া মরিতে হইবে। জ্ঞানী

শ্রেষ্ঠ সক্রিয় আনন্দের সহিত বিষপানে জীবনান্ত করিলেন। তথাপি সত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। আত্মা অমর এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন।

এ ছাড়া আর একজন মহাপুরুষ আমি নিজে দেখিয়াছি। তাঁহার পুস্তক পড়িয়াছি। তাঁহার মুখের উপদেশ খুঁজিয়াছি। তিনি আমাদের এ জেলায় কালীকচ্ছ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর দয়াময়, এই নাম লইয়া কার্য করিলে মানুষ অমর হইবে- ইহ পরলোক এক হইবে-জগতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে-সকল জাতি এক মহতী জাতিতে পরিণত হইবে-ধর্ম সমাজ শাসন করিবে-জগত সুখী হইবে-জ্ঞান প্রেম ও কর্ম হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র বিরাজ করিবে। তিনি বলিয়াছেন মানুষ ছাড়িবার কিছুই নাই। সব শক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে মানুষ পূর্ণ হয়-প্রকৃত বিদ্বান হয়। তখন সংসারে এবং স্বর্গ, বিত্ত অনুকূল হয়-হৃদয়ে জগত প্রকাশিত হইয়া পড়ে-মনস্তির হয়-জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সকল অভাব মোচন হয়। দেবত্ব নরত্ব চলিয়া গিয়া মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়।

এককী নয় জগৎ লয়ে

চলরে আনন্দ হয়ে।

এরূপ আশার কথা তিনি বলিতেন। জগতের হিতে তুমি সৃষ্ট হইয়াছ। জগতের নিমিত্তে সর্বদা কার্য কর। তা হলেই শান্তি আসিবে।

-ছাত্র গুরু।

সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দয়াময়ের প্রত্যাদেশ পাইলেন, “তিন বৎসর পর বিনা নিমন্ত্রণে জগৎ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে” এই দৈববাণী পাইয়া পরবর্তীকালে সময় সময় আমাদের কাছে এই সুসমাচার বলিতেন। তাঁহার শ্রীমুখে এই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা অবাক হইয়া কত কথা ভাবিতাম। কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

অনেকদিন পূর্বে তিনি কুমিল্লা জেলার ভিরাল্লা গ্রামের জনৈক ভক্তের বাড়ী হইতে পদব্রজে দেবীদ্বার যাইতে ছিলেন, আমরাও কয়েকজন ধর্ম বন্ধু তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ রাস্তার এক স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের কাছে বলিলেন, “একদিন বিছানায় শুইয়া দেখিতে পাইলাম জগৎ আমার সঙ্গে কাৎ হইয়া যাইতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়া মনে করিলাম, ইহা হয়ত আমার চক্ষুর ভ্রম হইতে পারে, সুতরাং চক্ষুদ্বয় কাপড় দিয়া মুছিয়া আবার বিপরীত পার্শ্বে শয়ন করিতেই স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম সমগ্র জগৎ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কাৎ হইতে চলিয়াছে।” তিনি আনন্দের সহিত এই দর্শনের কথা আমাদের কাছে বলিয়া ছিলেন। তাঁহার উপরোক্ত বাণী শ্রবণ ও দর্শনের কথা প্রায়ই চিন্তা করিতাম। প্রকৃত তত্ত্বে লিখা আছে “সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্তে বিশেষ লোক একজন আসিবেন এবং তাঁহার কথা জগত শুনবে।” শ্রী আনন্দের এই ভবিষ্যত বাণীর সঙ্গে তাঁহার এই দর্শন ও বাণী শ্রবণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

একদিন শ্রীশ্রীকর্তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “বাবা শ্রী আনন্দের নির্দেশিত এই বিশেষ ব্যক্তি কে? কখন তাঁহার আবির্ভাব হইবে? তিনি এ কথার কোন সদুত্তর দিলেন না। পরবর্তীকালে আমরা দেখিতে পাইলাম যিনি সর্ব ধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতকে এক সুত্রে গ্রথিত করিবার জন্য অহোরাত্র সাধন করিতেছেন তাঁহার কার্য প্রণালী লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম তিনিই সেই জগত বরণ্য মহাপুরুষ যাহার কথা প্রকৃত তত্ত্বে বর্ণিত আছে।

সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মাণ্ডপতি দয়াময় কয়েকটি উপাসনার মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্বের সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

সর্ব ধর্ম মিশন উৎসব-কৃষ্ণনগর

৫ই পৌষ-১৩৪১বাং

উপাসনা-

সর্ব ধর্মানুসারে আজ মিশনের কার্যকারীদের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে। “একজন বিশেষ লোক আসিবেন” এই কথার শেষ মীমাংসা হইবে। যাহাদের যত্নে মিশন গড়িয়া উঠিবে তাহাদের মোট সংখ্যা তিন শত। এই তিনশত লোকের কার্যই এখন আসিল। তন্মধ্যে ১২টি নাম পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন ৩৬টি নাম ও আসিয়াছে। ১২জনের কার্য নিয়াই আরম্ভ ৩৬জন লইয়াই পরিসমাপ্তি। ইহাদের প্রত্যেকেই আদর্শ।

৩৬জনের মধ্যে ষোল আনা কার্য আসিয়াছে। তিনশত লোক ইহা বহন করিবে-কার্যভার লইয়া সর্বত্র প্রচার করিবে। তিনশত লোকের মধ্যে সকল প্রকারে সাধন উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৬টি নামেতে আদর্শ কার্য আসিল। এখন-“মহাকালী ও দয়াময়” নামের কার্যভার নিতে একজন স্ত্রীলোক আসিল এবং তাহারই আদর্শ পতি হিসাবে অপর একজন আসিল। উভয়কে লইয়াই মিশনের কার্য সর্ব বিভাগে প্রকাশ পাইল। সুতরাং তিনশো লোকের কার্য ছত্রিশ জনের কার্য এবং ১২ জনের কার্য সকল দিক লইয়া অদ্যাবধি উক্ত দুই জনের মধ্যে হাসিল হইয়াছে। জগতের ভার নিতে পারে কয় জন আছে? একথা এখন দয়াময় বলিলেন। বাস্তবিক সকলের জন্য জীবন দিয়া কার্য করিতে পারে- প্রাণ মন মিশনের উদ্ধারার্থে দিতে চায় এ ব্যক্তিকে (এরূপ যার জীবনের ব্যাপারে) সেই বিশেষ ব্যক্তি হইবেন-যার কথা প্রকৃত তত্ত্বে লেখা রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই মিশন পূর্ণ হইবে। পাঁচজন লোক নিয়া শেষ যোগ আসিল, এজন্য সর্বাত্মে স্ত্রী-পুরুষের কার্য নিয়া সাধনের পরিপূর্ণতা সাধিত হইতে পারে তাহার প্রতিকার হইল। সুতরাং যাহাকে মিশন সর্বাত্মে মানিবে তাহাকে কার্যকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। বাস্তবিক আজ দুইটি স্ত্রী-পুরুষের কথা বলা গেল। এ কারণেই পাঁচ জনের কার্য ও শেষ যোগেতে চির দিনের জন্য পরিষ্কার হইয়াছে।

৫ই পৌষ-১৩৪১বাংলা

কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্মোৎসব

উপাসনা-

- ১। জগতের কার্য নিয়া মিশন আবির্ভূত হইয়াছে। পঁচিশ প্রকারের সাধকতার কার্যও এখন হইতে মিশনের ভিতর দিয়া প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারিবে।
- ২। সর্ব ধর্ম মিশনের জন্য যে যত স্বার্থ বিসর্জন করিতে পারিবে তাহাতে তত বেশী কার্য পথ সুগম হইবে ইহার জন্যই সকলের জীবন গড়িয়া নিতে হইবে।
- ৩। যে যেখানে কার্য করিবে সে তথাকার সমুদয় বিষয় নিয়া মিশনের নিমিত্তে কার্য ক্ষেত্র গড়িয়া লইতে পারিলে ইহাতেও জীবনের কার্য সুগম হইতে পারিবে।
- ৪। স্বামী ও স্ত্রী মিলিত হইয়া কার্য করিয়া যাইতে পারিলেও মিশনের উপায় হইবে, সাধনের কার্যও লাভ করিতে পারিবে।
- ৫। ছত্রিশ হাজার নামেতে কর্মচারী দিগের মধ্যে কার্য আসিল। কেহই সাধন না করিয়া মিশনে চাকরী করিতে পারিবে না।
- ৬। “একজন বিশেষ লোক আসিবে” এই কথার সাধন দেখা দিল। লক্ষী নামে যে স্ত্রীলোকের কথা বলা হইয়াছে সেই স্ত্রীলোকের জন্য যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগে আদর্শ পতি হইবে সেই ব্যক্তিই সেই বিশেষ লোক জানিবে। মিশন গড়িয়া লইবার নিমিত্ত যাহার উপর ভার পরিবে সেই ব্যক্তি উক্ত বিশেষ লোক ইহা নিশ্চিত জানিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সর্ব ধর্ম মিশন ৩০০ বিশাল স্তম্ভের উপর স্থাপিত

মিশন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মিশনের উন্নতির জন্য সর্বদা সাধন করিতেন, অর্থের জন্যও যাবতীয় কার্য করিতেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যও সম্পত্তি দান সংগ্রহ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। মিশনের সভ্য সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেজন্যও সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। জগতের সমর্থন পাওয়ার জন্য তিনি ১৩৩০ বাংলা সনে দয়াময়ের আদেশ লইয়া সর্ব ধর্ম মিশন ১৮৬০ইং সনের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতা হাই কোর্টে রেজিস্ট্রি করিয়া লইলেন। এ ব্যাপারে কলিকাতা হাই কোর্টের বিশিষ্ট এটর্নি জে এন, বসু মহাশয় শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তারপর ১৩৩০ বাংলা সনে তিনি মিশনের প্রথম শ্রেণীর সভ্য হইয়া মিশন সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। মিশনের উন্নতির জন্য যাহারা দেহ, মন, প্রাণ, বিত্ত, অর্থ যথা সর্বস্ব মিশনে উৎসর্গ করিতে পারেন তাহারাই মিশনের প্রথম শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন। মিশনের উন্নতির জন্য তিনি তনু, মন, ধন সবই অর্পণ করিলেন।

১৩৪১ বাংলা সনের পৌষ উৎসব কালে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দয়াময় আদেশ পাইয়া জানিতে পারিলেন যাহারা মিশনের কার্যকারী তাদের মোট সংখ্যা তিন শত। তখন মিশনের সভ্য

সংখ্যা তিন হাজার ছিল। ইহাদের মধ্যেই ৩৬ জন আছে এবং ইহাদের মধ্যেই ১২ জন আছে এবং ইহাদের মধ্যেই ৫জন রহিয়াছে। প্রয়োজনানুসারেই দয়াময় ইহাদেয়ে নিয়া ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ লইয়া পৃথক পৃথক চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেহই মিশনের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নহে। প্রত্যেকেই মিশনের এক একটি স্তম্ভ। সুতরাং তিনশো বিশাল স্তম্ভের উপরই সর্ব ধর্ম মিশন স্থাপিত। ৩৬ জনই অগ্রে মিশনের কার্য করিবেন। একজনই সর্ব শ্রেষ্ঠ যাহার কথা প্রকৃত তত্ত্বে বর্ণিত আছে।

এখন মিশন দয়াময় রাজ্য নিয়া শেষ যোগে কার্য করিতে আরম্ভ করিল। ৩৬ জন আদর্শ এবং তিনশত কার্যকারী ও তিন হাজার নামের লোক একত্র হইল। তিন শতে তিন জন, তিন হাজারে ৩০জন, জগতের মধ্যে সকলের জন্য একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ আর মিশনের মধ্যে ও সকলের কার্য পরিচালনার্থে সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্ত বিশেষ লোক একজন আসিবেন, এই ছত্রিশ জন হইল।

অর্থাৎ	তিন শতে	: ০৩ জন
	তিন হাজার	: ৩০ জন
	জগতের পিতামাতা	: ০২ জন
	সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্তে	: ০১ জন
	মোট : ৩৬ জন	

জগতের জন্য যাহারা দেহ প্রাণ উৎসর্গ করিবেন তাহারা ৩৬জন হইবেন। সর্ব ধর্ম মিশনের কার্য এই যে ইহা প্রত্যেকের

জীবনে সাধন পথ সুন্দর ও সহজ করিয়া তুলিবে, সাধন পথের কষ্টক দূর করিয়া দিয়া শান্তি আনয়ন করিবে।

কৃষ্ণনগর সর্ব ধর্মোৎসব

২রা পৌষ-১৩৪১ বাংলা

উপাসনা-

৩৬ জন মানুষের কার্য আসিল। তাদের কার্য নিয়াই মিশন গড়িয়া উঠিবে। তাঁহাদের নামঃ-

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ১। চন্দ্র কুমার দত্ত | ২। রসিক বাবু |
| ৩। হরি মোহন আচার্য | ৪। সুরেন্দ্র সাহা |
| ৫। কুমুদ বন্ধু দেব | ৬। রাম মোহন আচার্য |
| ৭। মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী | ৮। ভারত চন্দ্র সাহা |
| ৯। নবদ্বীপ রায় | ১০। তারিণী বাবু |
| ১১। লব চন্দ্র পাল | ১২। চপলা সুন্দরী পাল |
| ১৩। মনোমোহন দত্ত | ১৪। সৌদামিনী দত্ত |
| ১৫। আহলাদিনী সাহা | ১৬। কৃষ্ণ কুমার বণিক |
| ১৭। শশী ভূষণ রায় | ১৮। রমেশ সরকার |
| ১৯। পরেশ চন্দ্র দাস | ২০। খগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য |
| ২১। গোলক বাসী রায় | ২২। রাজ মোহন পাল |
| ২৩। গিরীশ চন্দ্র রায় | ২৪। ইন্দ্র কুমার রায় |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ২৫। সুক্ষদা | ২৬। সরিয়ত উল্লা সা সাহেব |
| ২৭। ধীরেন্দ্র বানার্জি | ২৮। কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার |
| ২৯। যোগেন্দ্র চন্দ্র পাল | ৩০। অমর চাঁন পাল |
| ৩১। সুশীলা | ৩২। চিন্তামণী |
| ৩৩। কুসুম কামিনী | ৩৪। রজনী ফকির |
| ৩৫। কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার | |
| ৩৬। শশী ভূষণ রায় চৌধুরী। | |

উক্ত লোকদের কার্য আজ হইতে শেষ যোগে আসিল। অদ্যাবধি
মিশনে কার্যভার লইতে লোকের অভাব পরিবে না।

৩রা আষাঢ় শুক্রবার ১৩৫৫ বাংলা

মিশন বাড়ী-কৃষ্ণনগর

উপাসনা-

- ১২ জনের গ্রোপ (বাণী)
- ১। শ্রীমতী বিলাসিনী রায় চৌধুরী।
 - ২। শ্রীমতী মনোরমা দেবী।
 - ৩। শ্রীমতী চারু নলিনী রায় চৌধুরী।
 - ৪। চন্দ্র কুমার দত্ত এম, এ।
 - ৫। খগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য।
 - ৬। কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার।
 - ৭। পরেশ চন্দ্র দাস।
 - ৮। কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার।

- ৯। শশী ভূষণ রায় চৌধুরী।
 - ১০। নবদ্বীপ চন্দ্র রায়।
 - ১১। নলিনী কান্ত লোধ বি, এ।
 - ১২। হিরালাল পাল বি,এ (বর্তমান এম, এ, বি, টি)
- যে ৫ জন বিশেষ ব্যক্তি লইয়া মিশনের আদর্শ কার্যকরী গ্রোপ
গঠিত হইয়াছে তাহাদের নামের উল্লেখ কোথায়ও দেখিতে পাওয়া
যায় নাই।

শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ বলিয়াছেন:-

জীবন মুক্তির পথে ৩টি বিশেষ ব্যক্তিকে আদর্শ মনে করিবে।
তাহাদের নাম ক্রমে বুঝিবে।
মিশনের মধ্যে কার্যকারীদের সংখ্যা এক লক্ষ না হইলে
পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ৩২ বৎসর অধিক কাল যাবত কৃষ্ণনগর আশ্রমে থাকিয়াই অন্যান্য কর্মচারী সহ মিশনের সমস্ত কার্য করিতেন। সময় সময় উজানচর হেড অফিসে যাইয়াও কোন কোন কার্য করিতেন। কখন কখন মিশনের সভা সমিতি উজানচর হেড অফিসেই আহ্বান করিতেন। পরবর্ত্তীকালে হেড অফিসের যাবতীয় কার্য কৃষ্ণনগর আশ্রমেই সম্পন্ন হইত। কৃষ্ণনগর আশ্রম যে স্থানে ছিল তাহার আয়তন তেমন বড় ছিল না। উৎসব কালে বহু লোক সমাগম হইত। এই অল্প পরিসর স্থানে কোন রকমে উৎসবের যাবতীয় কার্য সমাধা করিতে হইত। তিনি ভাবিলেন, জগত মুক্তির জন্যই মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ক্রমেই ইহা জগতে বিস্তার লাভ করিতেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই অল্প পরিসর স্থানে মিশনের যাবতীয় কার্য চলিতে পারিবে না ভাবিয়া ইহার হেড অফিসের জন্য একটি উপযুক্ত প্রশস্ত স্থানের তালাস করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি জানিতে পারিলেন আগরতলার অনতি দূরে অরুন্ধতী নগরে এক বিস্তীর্ণ অনাবাদী এলাকা পড়িয়া রহিয়াছে। অরুন্ধতী নগর এক উচ্চ টিলার উপর অসমান গড়লায়েক পতিত ভূমি বিশেষ। এ স্থানের এক দিক খুব উচ্চ। ইহাকে শিবের টিলা বলে।

অপরদিকে ক্রমেই ঢালু ইহার কোন স্থান উচু, কোন স্থান নিম্ন সমতল, কোন স্থান প্রকাণ্ড গহবরের মত জঙ্গলাকীর্ণ গভীর নিম্ন ভূমি। সমতল ভূমিতে ঘরবাড়ী, অফিস করিবার যথেষ্ট উপযুক্ত স্থান আছে। ইহার খবর পাইয়া ঐ স্থান দেখিবার জন্য তিনি অরুন্ধতী নগরে চলিয়া আসেন। তিনি অরুন্ধতী নগরের সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন। এ স্থানের আয়তন দেখিয়া এবং এ স্থানে মিশনের হেড অফিস স্থাপন করিলে ভবিষ্যতে সুবিধা হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর মিশনের হেড অফিস এখানে হইবে ইহা অন্তরের সহিত বুঝিতে পারিলেন। অরুন্ধতী নগর আগরতলা শহরের ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আগরতলা হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা অরুন্ধতী নগর চলিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে আগরতলা হইতে যাতায়াতের আরও সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি মিশনের হেড অফিসের জন্য অরুন্ধতী নগরের উক্ত এলাকা বন্দোবস্ত নিতে মনস্থ করিলেন। অরুন্ধতী নগর আগরতলা মহারাজের খাস মহলের সম্পত্তি ছিল। স্থানীয় মিশন সভ্যগণ হইতে সাহায্য নিয়া ১৩৫৫ বাংলা সনে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আগরতলার মহারাণী শ্রীযুক্তা কাঞ্চন প্রভা দেবী হইতে ১০ দ্রোণ সম্পত্তি রায়তি বন্দোবস্ত লইলেন। অতঃপর অরুন্ধতী সংলগ্ন গোলটিলা নামীয় এক গোলাকার মনোরম উচ্চ ভূমি জগত চন্দ্র পাল হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন। এই গোলটিলার মধ্যস্থান উচ্চ চারিদিকে ঢালু নিম্ন ভূমি।

গোলটিলার চারি পার্শ্বে যাতায়াতের এক প্রশস্ত রাস্তা আছে। অরুন্ধতী নগরের সম্পত্তি ও গোলটিলা এই দুইটি বিস্তীর্ণ স্থান পাইয়া এবং ইহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ কৃষ্ণনগর আশ্রমে চলিয়া আসেন।

এ দিকে কৃষ্ণনগর আশ্রমের দক্ষিণাংশের অনেক স্থান নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় এই সঙ্কীর্ণ স্থানে মিশনের হেড অফিসের কার্য করা বড়ই অসুবিধা হইল। তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি পরিচালক সমিতির এক সভা আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর উজান চর কৃষ্ণনগর হইতে মিশনের হেড অফিস ভোলাচং জয় দুর্গা আশ্রমে স্থানান্তরিত করিবার এক প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ মিশন হেড অফিস ভোলাচং স্থানান্তরিত করিবার ভার মিশনের পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত করিয়া ১৩৫৭ বাংলা সনের ২২শে চৈত্র কৃষ্ণনগর হইতে অরুন্ধতী নগর চলিয়া যান। পরে ১৩৫৮ বাংলা সনের ১৮ কার্তিক উজানচর কৃষ্ণনগর হইতে মিশনের হেড অফিস ভোলাচং জয় দুর্গা আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি মিশনের হেড অফিসের কার্য এখানেই চলিতেছে। সেই সময় হইতেই জয় দুর্গা আশ্রমের কার্য স্থগিত রাখা হয়।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অরুন্ধতী নগর আসিয়া কোন এক নূতন বাড়ীতে কিছুকাল অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। পরে অরুন্ধতী নগরে ১৩৫৮ বাংলা সনের ১৮ পৌষ তারিখে প্রাতে ৮টা ৩০ মিনিটের সময় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের নাম

সর্ব সমাজ আশ্রম। ২৫ জন মিশন সভ্য লইয়া তিনি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য উদ্ধার করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য শেষ করিয়া তিনি বলিলেন-“ভবিষ্যতে এই আশ্রম লইয়াই মিশনের হেড অফিস গড়িয়া উঠবে, এই স্থানেই সর্ব ধর্ম মিশন জগত লইয়া কার্য করিবে এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মিশন আশ্রম হইবে। উক্ত আশ্রমের আসন ঘরের নাম সর্ব সমাজ রাখা হইল।

সর্ব সমাজ আশ্রম সংলগ্ন উত্তর দিকের ভূমিতেই শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ তাঁহার আবাস ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং ১৩৬১ বাংলা সনের মাঘ মাসে তিনি সপরিবারে এই বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তদবধি সাধন ভজনের যাবতীয় কার্য তিনি প্রত্যহ সর্ব সমাজ আশ্রমের উপাসনা গৃহেই নিয়মিত ভাবে করিতেন। সারা জীবন তিনি নিজের স্থায়ী কোন বাসস্থান প্রস্তুত করেন নাই। অনন্ত জগত যেমন দয়াময়ের আবাস ভূমি তিনিও তদ্রূপ মিশন কেন্দ্র গুলিকেই নিজ বাসস্থান মনে করিতেন। আমিষের খেলা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিতে পাই নাই। তিনি জগতকেই নিজ পরিবার মনে করিতেন।

যে স্থানে সর্ব সমাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ঐ স্থান একটি উচ্চ সমতল ভূমি। এখানে কোন জলাশয় নাই। অরুন্ধতী নগরের সমতল ভূমির মাঝে মাঝে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ কিছু গহবরের মত নিম্ন ভূমিও আছে। ঐ সকল নিম্ন ভূমিতে পাত কুয়া খনন করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান এই স্থানকে সর্ব ধর্ম মিশন কলোনী নামে অভিহিত করা হয়। এখন কতিপয়

মিশন সভ্য মিশন কর্তৃপক্ষ হইতে বন্দোবস্ত লইয়া স্থানে স্থানে বাস স্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। এই কলোনীতেই স্কুল, বাজার, ডাকঘর স্থাপন করা হইয়াছে। সদর রাস্তার উপর বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কলোনী আগরতলা শহরের উপকণ্ঠ বলিয়া দিবারাত্র যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। অরুন্ধতী নগরের রাস্তা পাকা হওয়ায় চলাফেরা অনেক সুবিধা হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও অরুন্ধতী নগর অনেকটা মরুভূমির মত পরি-লক্ষিত হইত। এ স্থানে কর্তা মহারাজ বহু সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনার দরুণ মরুভূমি আজ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হইয়াছে। বর্তমানে এই খানেই বহু আম, কাঁঠাল, কলা, বাশ, লিচু শাক সবজি ইত্যাদির ফলন প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। তিনি বলিতেন ভবিষ্যতে এখানেই সারা দেশের চলাচলের সুব্যবস্থা হইবে।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বিভিন্ন উপাসনায় এ স্থানে মিশনের হেড অফিস সম্পর্কে যে আভাষ দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপাসনা-

৭ভাদ্র-১৩৬০ বাংলা

আজ অভিনব বিষয়ে সাধন উপস্থিত হইল। ইহার অর্থ এই যে আজ থেকে সর্ব ধর্ম্মানুসারে এই মিশন কলোনীর কার্য অতীত পূর্ব পরিবর্তন হইয়া আসিল। এই জন্য আজ সর্ব ধর্ম্ম মিশনের ষোল আনা কার্য সাধন ও ব্যবস্থা এখানে আবির্ভূত হইল। এই

কলোনীতেই আজ দয়াময়ের পরিপূর্ণ বিকাশ পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব মিশনের জন্য অন্য কোন স্থান নির্দেশ নাই-যে স্থানে মিশন সর্ব প্রকারে কার্য করিতে পারে। এই স্থানেই আদি, মধ্য ও অন্ত সর্বতো-ভাবে মিশনের কার্য উদ্ধার হইবে। চিরদিন মিশন সাধনার হিসাবে এই খানেই কার্য করিবে।

উপাসনা

২০ভাদ্র-১৩৬০ বাংলা

দয়াময় আজ মিশনের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। অতএব মিশন কোনদিন বিনষ্ট হইতে পারে না-মিশনের কার্যে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব দয়াময় নামের প্রচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হইল। দয়াময় সর্ব প্রকার আশ্রমের পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধযোগে ব্যবস্থা বাহির করিলেন। দয়াময় জগতের নিয়ন্তা হিসাবে মিশনের কার্যভার গ্রহণে সকলের চিন্তা বিদূরিত করিলেন।

উপাসনা-

৩০ভাদ্র-১৩৬০ বাংলা

আজ মিশনের মধ্যে সর্ব প্রকার অর্থবল সিদ্ধ হইয়াছে। এ জন্য প্রথমাবধি আজ পর্যন্ত বিঘ্ন বিপত্তি যা কিছু ছিল তৎ সমস্তই শেষ হইল। দয়াময় এখন হইতে মিশনের কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং যখন যাহা আবশ্যক হয় নিজেই আনিয়া উপস্থিত করিবেন। অতএব জগতের মধ্যে মিশনের কার্য সর্ব প্রকারে উদ্ধার

করিলেন। শান্তি, সাধন এবং সমাজ এই তিনটি বিষয়ই সর্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া মিশন কার্য্য করিবে।

উপাসনা-

১আশ্বিন-১৩৬০বাংলা

এখন সকলে মিলিত হইয়া মিশনের উন্নতি কল্পে সাধন করিবে এবং টাকা কড়ি ব্যবস্থা হইতে পারে তজ্জন্য সর্ব প্রকারে সকল স্বার্থ ত্যাগ করিবে। এজন্য বলি সর্বাঙ্গে অল্প সংখ্যক লোকই মিশনের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবে। একটি ব্যবস্থা দেখা দিল ইহা এই যে এক্ষণ মিশনের কার্য্য পরিচালনার জন্য ৫জন লোক সর্বাঙ্গে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবে। এই পাঁচ জনের মধ্যে সাধন প্রকাশিত হইবে, সর্ব প্রকারে হৃদয় মন লইয়া ইহারা কার্য্য করিবে এবং মিশন ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাহারা মনোনিবেশ করিবেনা। এখন জগতের উপকারার্থে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের সেবার ভার সর্ব প্রকার উদ্ধার হইয়াছে। ইহাদের কার্য্যের শ্রোতে আরও কয়েকজন লোক জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বাকী সময়ে এইরূপ বহু লোক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সংসার পরিত্যাগ করিয়া মিশনের নিমিত্ত সর্বস্ব বিসর্জন করিবে। জগতের কার্য্য ব্যতীত কেহই উন্নতি করিতে পারিবেনা। দয়াময় কার্য্যকারীদিগকে শক্তি দিবেন যাতে প্রত্যেকে শান্তির সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মিশনের কার্য্য পরিচালনা

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অরুন্ধতী নগর চলিয়া যাওয়ার পর ভোলাচং মিশন অফিসের কার্য্যভার যাহাদের উপর অর্পিত ছিল তাহারা ঠিক ভাবে মিশন সেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় মিশনের উন্নতির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইজন্য তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। মিশনের কাজে মিশন কর্মচারীদের অবহেলা দেখিয়া তিনি দুই বার আমাকে মিশন পরিচালনার কার্য্য করিতে আহবান করিয়াছিলেন। সাধনে হীণবল এবং সংসারের অব্যবস্থার দরুণ আমি তখন মিশনের কাজে যোগদান করিতে সাহস পাই নাই। অবশেষে ১৩৬৩ বাংলা সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য অরুন্ধতী নগর গিয়াছিলাম। একদিন প্রাতঃকালে তিনি ভোলাচং মিশনের কর্মচারীদের অবহেলার অনেক কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন-তুমি মিশনের কাজ করিতে ভয় পাও কেন? আমরা আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া মিশনের কাজ করিয়া যাইতেছি। আজ আবার তোমাকে বলিতেছি তুমি ভোলাচং মিশনের কার্য্যভার গ্রহণ কর। যদি অস্বীকার কর তবে কোন দিন তোমাকে আর মিশনের কাজ করিতে বলিবনা। অনেক কথা বলিয়া তিনি আমাকে প্রবোধিত করিলেন। তাঁহার এই হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম বাবা,

আপনার আদেশ আর অমান্য করিতে পারিনা। দুই বার আপনার আদেশ অমান্য করিয়া অপরাধ করিয়াছি। এখন যাহা বলেন তাহাই করিব। আমি বলিলাম আমার সংসারের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিলেই আমি মিশনের কাজে যোগদান করিতে পারি। তিনি বলিলেন তোমার বাড়ী ঘর, সম্পত্তি, দীঘি পুষ্করিণী সব বিক্রয় করিয়া চলিয়া আস। কিছুই রাখিতে পরিবেনা। বেচা বিক্রীর উদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে একটা নাম দিলেন। প্রয়োজন বোধে সমস্ত কার্য উদ্ধারের জন্য তিনি স্বয়ং কিছু কাজ করিবেন ইহাও তিনি বলিলেন। শ্রীগুরুই অসীম কৃপায় বহু চেষ্টা করিয়া সবকিছু বিক্রয় করিয়া ১৩৬৩ বাংলা সনের ২৭শে ফাল্গুন সপরিবার বরকাতা আনন্দ আশ্রমে চলিয়া আসি। অতপর শ্রীগুরুর আদেশে ১৩৬৪ বাংলা সনের ২১শে ভাদ্র মিশনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করি। এই বৎসরই মিশনের সভ্য রমনী মোহন মজুমদারকেও হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

আমরা ভোলাচং মিশনের কার্য ভার গ্রহণ করিলে পর তিনি বলিলেন-মিশনের হিসাব পত্র সব শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, মেমোরেণ্ডাম পড়িয়া মিশনের সব আইন কানুন জানিয়া লও। মিশন এখন উন্নতির পথে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। এখন আইনের মাধ্যমেই মিশনের সকল কার্য করিতে হইবে, আশ্রম গুলি প্রতি বৎসর

তিনবার পরিদর্শন করিবে। মিশনের বিষয় চিন্তা কর এবং ইহার উন্নতির পথ বাহির কর আমি দূরে থাকায় মিশনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক আশ্রমে কমিটি গঠন করিয়া আশ্রম গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। মিটিং ঠিকভাবে করিতে হইবে। রিজলিউশান বইও রাখিতে হইবে। এভাবে তিনি মিশনের কার্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া মিশন সেবা করিতে বহু উপদেশ দেন।

এক পত্রে তিনি লিখিলেন দয়াময়ের উপর নির্ভর করিয়া মিশনের কাজ করিয়া যাও। জানিও মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অর্থাৎ আমি তু ছাড়িয়া দাও। মিশনের জন্য যাহা করিতেছ ও করিবে তাহাই মিশন সেবা বলিয়া গন্য হইবে। যতদিন তিনি ইহলোকে ছিলেন ততদিন তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য বহু উপদেশ দেন। মিশনের কাজ যতই অগ্রসর হইতেছে ততই দেখিতেছি মিশনে তার শক্তি বলেই সকল কার্য উদ্ধার হইতেছে। অন্যের কোন ব্যক্তিত্ব বা কার্যকারিত্ব নাই, মিশনের সমস্ত শক্তি তাহারই যে নাম লইয়া স্বামিজী মহারাজ জগতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন সেই নাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতকে মুক্ত করিতেই মিশন হইয়াছে। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিলেন মিশনের একটা ডায়নামা আছে সেই ডায়নামার শক্তিতেই মিশনের সমস্ত কার্য উদ্ধার হইবে। মিশনের ডায়নামা চালু না করিলে মিশন অচল হইয়া যাইবে।

যতই দিন যাইতেছে আমরা দেখিতেছি সাধন ব্যতীত মিশনের কোন কার্যই উদ্ধার হইতে পারে না। মিশনের নিজ শক্তি বলেই মিশনের জনবল অর্থবল ও ধর্ম বল বৃদ্ধি পাইতেছে। মিশনের কাজ দয়াময়ের কাজ এক এবং একই। দয়াময়ের সমস্ত কার্যই এখন মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। সর্ব নিয়ন্তা দয়াময়ের আদেশেই মিশন হইয়াছে এবং তিনিই স্বয়ং মিশন পরিচালনা করিতেছেন। যখন যাহা প্রয়োজন তিনিই আনিয়া সব উপস্থিত করিতেছেন। সুতরাং দয়াময়ের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে পারিলেই মিশনের সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। আমি তু লইয়া কার্য করিলে কেহই কিছু করিতে পারিবে না। অতীতে ইহার প্রমাণ অনেক রহিয়াছে। অতএব মিশনের প্রত্যেক কার্য উদ্ধারের জন্য সাধন করিতে হইবে। সাধনে যে যত অগ্রসর তাহা দ্বারা জগতের কার্য তত বেশী উদ্ধার হইবে। “তুয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিসেন যথা নিযুক্ত হস্মি তথা করোমি” এই মহাবাক্য লইয়া কার্য করিয়া যাইতে পারিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন দেখিতেছি মিশন দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি। অর্থাৎ শ্রীমৎ আচার্য মহারাজের কার্য আদর্শ মনে করিয়া তাঁহাকে জগৎ বুঝিতে পারে এবং তাঁহার আদর্শ নিয়া সকলে জীবন গঠন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই মিশন হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় কালীকচ্ছ প্রসঙ্গ

কালীকচ্ছের দেওয়ান রাম দুলাল নন্দী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জগজ্জননী মা কালীর উপাসক ছিলেন। মা কালীর আদেশ মান্য করিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। ব্রহ্মচার্য পালন করিয়াই তিনি জীবনাবধি চলিতেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার শারীরিক সম্বোগ ছিল না। পরবর্তী কালে জগজ্জননীর আদেশ পাইয়া তিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। যথা সময় তাঁহার এক ভুবন বিখ্যাত পুত্র সন্তান জন্মে। তাঁহার নাম আনন্দ। ভূমিষ্ঠ হইবার কালে মা কালী তাহাকে কোলে লইয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রী আনন্দই সর্ব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। শ্রী আনন্দের একমাত্র পুত্র পরম ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন এবং দেশ বিখ্যাত শিল্পীও ছিলেন। ধর্ম সাধনায় তিনি উচ্চাধিকারী ছিলেন। শত সহস্র নর-নারী তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিতেন। জগতের কল্যাণ কল্পে তিনি তাঁহার পিতার আদর্শ মান্য করিয়াই কার্য করিয়া গিয়াছেন। এমন নিরভিমান হিতৈষী ব্যক্তি ক্রটিৎ দৃষ্ট হয়। দেওয়ান রাম দুলাল ছিলেন কালী সাধক তৎপুত্র শ্রী আনন্দ ছিলেন সর্ব ধর্মের

অবতার এবং তৎপুত্র মহেন্দ্র বাবু ছিলেন একজন স্বনামধন্য প্রবীন সাধক। বংশ পরাম্পরায় একাদিক্রমে এমন তিন জন সাধক মহাপুরুষ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র বাবুর তিরোধানের পর তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ প্রায় অর্ধ শতাব্দী বৎসর পূর্বে ক্রমে ক্রমে কালীকচ্ছ আবাস ভূমি ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া যাওয়ায় কালীকচ্ছ দেওয়ান বাড়ী এখন ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। ১৩৬৫ বাংলা সনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আমাদেরকে কালীকচ্ছ আনন্দ পুরী সর্ব ধর্ম মিশন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তিনি বলিলেন বর্তমানে কালীকচ্ছ শ্রী আনন্দ ধাম উদ্ধার করাই সর্ব ধর্ম মিশনের শ্রেষ্ঠ কার্য যার ধর্মমত প্রচার করিয়া আমরা ইহপরলোক নিয়া কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি সেই জগত বরেণ্য মহাপুরুষের জন্মভূমি, তাঁহার সাধন ভূমি যদি আমরা উদ্ধার করিতে না পারি তবে সর্ব ধর্ম মিশনের উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে না। অতএব তোমরা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হও জগতের সর্ব তীর্থের মিলন ভূমি-দয়াময় নামের উদ্ধার ভূমি কালীকচ্ছ দয়াময় বাড়ী উদ্ধার করিতেই হইবে। তিনি পত্র লিখিয়া আবার আমাদেরকে জানাইলেন-“তোমরা কয়েক জন কৃত সংকল্প হইয়া কালীকচ্ছ দয়াময় বাড়ী উদ্ধারের জন্য কার্য ক্ষেত্রে যথা

শক্তি নিয়োগ কর-ইহাই আমার অন্তরের কথা” দয়াময় বাড়ী উদ্ধারের জন্য তিনি শেষ জীবনের কয়েক বৎসর রোজ রোজ নিয়মিত ভাবে সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে না। কালীকচ্ছের কাজেই তাঁহার জীবনের শেষ সাধনার কার্য ইহা তিনি বলিতেন।

শ্রীগুরু বলিতেন-এখন দেওয়ান বাড়ীর ঐশ্বর্য্য নাই-পূর্ব গৌরব নাই। আছে ফকিরী সম্পদ-আছে ঈশ্বরের প্রেমতীর্থ সেই পরাৎপর দয়াময় মন্ত্র। শ্রী আনন্দের সমাধি মন্দির প্রেম পুরী-আছে ব্রহ্ম মন্দির জগতের নাভি স্থল। তিনি বলিতেন ব্রহ্ম মন্দিরে জগতের সমস্ত সাধন সম্পদ নিহিত আছে। জগত এই সত্য ক্রমে জানিতে পারিবে। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি দয়াময় বাড়ীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজকে বলিলাম বাবা দয়াময় বাড়ীতে এখন কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, তুমি কেমনে জান এই বাড়ীতে এখন দয়াময় নাই। তদুত্তরে আমি বলিলাম যদি এই বাড়ীতে দয়াময় থাকিতেন তবে এই পুণ্য ভূমির এমন দুরবস্থা কেন? এই বাড়ীতে এখন সেবা পূজা করিবার কেহ নাই। শ্রী আনন্দের নিত্য নৈমিত্তিক সাধনাতে কার্য্যগুলিও প্রায় অবলুপ্ত অবস্থায় আছে। বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিলে এই বাড়ীর চারি দিকেই কেবল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তদুত্তরে

তিনি বলিলেন ব্রহ্ম মন্দিরে স্বামিজী মহারাজের সাধনার সমস্ত সম্পদ রহিয়াছে। এখানে স্বামিজী মহারাজ আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম মন্দিরে ধ্যান করিলে দেখিতে পাইবে এখানে জগতের সমস্ত ধন ভান্ডার রহিয়াছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম “ভস্মাঙ্কিত বহিবৎ” এই বাড়ীতে জগতের সমস্ত সম্পদ ডুবিয়া রহিয়াছে। সময়ে এই বাড়ীর দেব দুর্লভ সত্য জগত লাভ করিবে।

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের আদেশ পাইয়া আমরা কালীকচ্ছ দয়াময় বাড়ী উদ্ধারের জন্য প্রায় ১৮-বৎসর যাবত আইনের মাধ্যমে চেষ্টা করিতেছি। সর্ব ধর্মের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু সেবক সেবিকা নিয়মিত ভাবে ব্রহ্ম মন্দিরে ও গাছতলা মন্দিরে সেবা পূজা করিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর মিশন হইতে আমরাও কালীকচ্ছ দয়াময় বাড়ীতে উৎসবাদি করিয়া আসিতেছি। এই মহান তীর্থ ভূমি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আশা করি এই পুণ্য ভূমি উদ্ধার হইবে। দয়াময় আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

ষোড়শ অধ্যায় ভ্রমণ কাহিনী

বাংলাদেশ ভ্রমণ :

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ১৩৬৪ বাংলা সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অরুণাচলীনগর হইতে বাংলাদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাতৃদেবীও ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি আউট পাড়া (ময়মনসিংহ) নারায়ণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। প্রতি বৎসর ৭ই জ্যৈষ্ঠ এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমিও সৌভাগ্যক্রমে আখাউরা স্টেশনে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহারই সঙ্গে আউট পাড়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। শ্রী গুরুর শুভাগমনে উৎসবের যাবতীয় কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলার অনেক মিশন সভ্য এ উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রী গুরুর দর্শন পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। আনন্দময়ের আগমনে উৎসব কেন্দ্র আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। সর্বধর্ম্মাধীগণ অনেকদিন পর শ্রী গুরুর দর্শন পাইয়া তাদের প্রাণের কথা বলিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ আউট পাড়া আশ্রমে থাকিয়া প্রচার কার্য শেষ করিয়া ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তিনি নরসিংদী ভাগবত আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইলেন। উৎসবের দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় ভাগবত আশ্রমে আসিয়াই তিনি আমাকে উৎসব প্যাণ্ডেলে দাঁড়াইয়া “প্রকৃত তত্ত্ব” পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। উৎসবে শ্রীগুরুর আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় সভ্যগণ দলে দলে উৎসবে

যোগদান করিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তখন নরসিংদী ভাগবত আশ্রমের আয়তন খুব কম ছিল। বহু লোক সমাগম হওয়ায় সংকীর্ণ স্থানে চলাফেরা করা বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। উৎসবের পরদিন আশ্রমের ম্যানেজিং কমিটি ও মিশনের সভ্যগণকে লইয়া এক সভা আহুত হইল। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ স্বয়ং এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর যথারীতি সভার কার্য আরম্ভ হইল। আশ্রমের বহু আভ্যন্তরীণ গোলমালের মীমাংসা করিয়া তিনি আশ্রমের সমস্ত কাজের শৃঙ্খলা করিয়া সভার কার্য সমাপ্ত করেন। তৎপর সমস্ত প্রচার কার্য শেষ করিয়া তিনি বহরিয়া গমন করেন। বহরিয়া চাঁদপুর হইতে ৩মাইল দক্ষিণে মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। বহরিয়া গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বহরিয়া গ্রামের মিশন সভ্য অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হয়েছিলেন। স্থানীয় মিশন সভ্যগণের সহিত আশ্রম সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়া এবং অনেক প্রচার কার্য করিয়া বরকান্তা আনন্দ আশ্রমে সঙ্গীদের লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বহু লোক তাঁহার পদধূলি লইতে আসিলেন। বরকান্তা আনন্দ আশ্রমে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ভক্তদের লইয়া বহু উপাসনা করেন এবং বরকান্তা আশ্রমের যাবতীয় আলোচনা শেষ করিয়া কমলাপুর অশোক আশ্রম গমন করেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া আশ্রমের উন্নতি মূলক অনেক উপদেশ দেন এবং প্রচার কার্য শেষ করিয়া জিয়াপুর হইয়া দেবীদ্বার মিশন সভ্য কালাচাঁদ ধরের বাড়ীতে

উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি বহু সাধন ভজন করেন। তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া দেবীদ্বার থানার একজন ব্রাহ্মণ (থানা অফিসার) সস্ত্রীক তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং তাঁহার কোন অভিষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। অনেক অনুরোধ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ঐ অফিসার তাঁহাকে তাহার বাসায় জল সেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীশ্রীর সঙ্গে আমরাও কয়েকজন সেখানে গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দেবীদ্বার হাই স্কুলের প্রখ্যাত হেড মাষ্টার বসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। বসন্ত বাবু তাঁহার প্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে শ্রীশ্রীকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কথা প্রসঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে উভয়েই হাসিমুখে রবীন্দ্রনাথের কতক কবিতা আবৃত্তি করেন। একজন একটি কবিতা আবৃত্তি করিলে পর হাসিতে হাসিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত অপরজন আনন্দে বিভোর হইয়া প্রত্যুত্তরে আর একটি বিশ্ব কবির কবিতা আবৃত্তি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে উভয়েই উভয়কে হৃদয়ের গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। উভয়ের গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া আমিও আনন্দে বিহবল না হইয়া থাকিতে পারি নাই। বিদ্যানুশীলনের আলোচনায় এত আনন্দ জীবনে পাইব মনে হয় না। বসন্ত বাবু শ্রীশ্রীকে বলিলেন আপনি ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া কত উর্দ্ধে আছেন তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি না। আপনার জীবন ধন্য। তারপর হাসি মুখে বিদায় লইয়া বসন্ত বাবুর বাসা হইতে চলিয়া আসিলেন। পর দিন শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ দেবীদ্বার হইতে কোম্পানীগঞ্জ

আসিয়া নৌকা যোগে জামালপুর চলিয়া আসেন। ঐ গ্রামের মিশন সভ্য রাজ কুমার রায়ের বাড়ীতেই তিনি পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় মিশন সভ্যগণ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এখানে অনেক উপাসনা হইল। নামের প্রচার কার্য চলিতে লাগিল। বহু সঙ্গীতও হইয়াছিল। আনন্দময়ের আগমনে সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

জামালপুর দুই দিন অবস্থিতির পর তিনি আমাদিগকে লইয়া নৌকাযোগে ভোলাচং প্রস্থান করিলেন। নৌকাঘাট পর্যন্ত স্থানীয় মিশন সভ্যগণ তাঁহার পেছনে পেছনে অনুগমন করেন। শ্রীগুরু বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ কতিপয় মিশন সভ্য ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনিও তাদের অশ্রুধারা দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া বিহবল হয়ে পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে দ্রুত বেগে নৌকা বাহিতে বলিলেন। আমরা ও মেয়েদের এরূপ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। নৌকায় উঠিয়া তাদের বিগলিত ভাব দূর হইবার জন্য আমাদিগকে একটি নাম জপ করিতে বলিলেন। তারপর আমরা যথা সময় ভোলাচং মিশন বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

ভোলাচং মিশন বাড়ীতে আসিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে মিশনের বহু আলোচনা করেন ও আমাদিকে বহু উপদেশ প্রদান করেন। নিয়মিত ভাবে উপাসনা করিতেন। গায়কগণও বহু সঙ্গীত চর্চা করিতে ছিলেন। এ ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর তাঁহার শ্বশুর

বাড়ীতে যাত্রা করিলেন। বর্ষাকাল বলিয়া নৌকা যোগেই সেখানে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়া দেখিলাম সে রামও নাই সেই অযোধ্যাও নাই। গ্রাম জন মানব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বের গৌরব নাই গ্রামখানা যেন নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। একদিন সেখানে থাকিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া পরের দিন রামকৃষ্ণপুর গণপতি আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি দুই দিন অবস্থান করিয়া স্থানীয় মিশন সভ্যগণের সঙ্গে বহু ধর্মালোচনা করেন। অনেক উপাসনা করেন এবং সেখানকার প্রচার কার্য শেষ করিয়া ভোলাচং প্রত্যাবর্তন করেন। ভোলাচং মিশন অফিসে আসিয়াই তিনি একদিন কাঁঠালিয়া মনোমোহন আশ্রমে যাইয়া আশ্রম পরিদর্শন করেন। গ্রামের আত্মীয় স্বজন বহু বন্ধু বান্ধব হিন্দু ও মুসলমান এবং মিশন সভ্য অনেক দিন পর তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। কাঁঠালিয়া তাঁহার জন্মভূমি না হইলেও শৈশবকাল হইতে তিনি এ গ্রামে আসিয়াই লেখাপড়া শিখিয়া জীবনে উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে সমস্ত গ্রাম আনন্দ মুখর হইয়া উঠে। সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবার ভোলাচং চলিয়া আসেন। ভোলাচং আসিয়াই তিনি আমাদের উপর ভোলাচং মিশন পরিচালনার কার্যভার অর্পণ করেন। আমিও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া মিশন সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কি ভাবে মিশন সেবা করিতে হয় তৎ সম্পর্কে তিনি আমাকে বহু উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীগুরুর চরণ ভরসা করিয়াই এই দুরূহ কার্য করিতে অগ্রসর হইয়াছি। মিশন বাড়ীর সমস্ত

কার্য সমাধা করিয়া অতঃপর তিনি নৌকাযোগে আখাউড়া গমন করেন। সেখান হইতে তিনি অরুন্ধতী নগর প্রস্থান করেন।

আসাম ভ্রমণ

বাংলাদেশ ভ্রমণ করিয়া ৮/৯ মাস পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ আসাম ভ্রমণ করিবার মনস্থ করিলেন। আসামের বিভিন্ন জেলায় অনেক মিশন সভ্য তাঁহাকে আসামে পদার্পণ করিয়া পদধূলি দিতে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তিনিও আসাম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে ১৩৬৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি আসাম ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। শ্রীশ্রী মাও তাঁহার সঙ্গে আসাম ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জন এই ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ প্লেইনে সঙ্গীদের লইয়া শিলচর হইয়া লামডিং গমন করেন। তথাকার মিশন ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া অতীব আনন্দিত হন। সর্বত্র আরতি উপাসনার কার্য যথারীতি চলিতেছিল। অনেক দিন পর পরমানন্দ শ্রীগুরু ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মার চরণ দর্শন পাইয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। শ্রীগুরুর সেবা পূজার সুযোগ পাইয়া তাহারা বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। সেখানকার প্রচার কার্য শেষ করিয়া শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ সঙ্গীদের লইয়া বড়পাথার, গোলাঘাট, মুরান হাট, খোয়াংঘাট, সেফুন, ডিব্রুঘর এবং মার্গেরেটা ভ্রমণ করেন। তথাকার মিশন সভ্যগণ শ্রীগুরুর চরণ দর্শন পাইয়া সকলেই সাধ্যানুসারে উপাসনাদি কার্যে জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভোগরাগের বিধি ব্যবস্থাও সর্বত্র হইয়াছিল। সঙ্গে

জপাদি কার্যও সর্বত্র চলিত। এই ভাবেই প্রচার কার্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দয়াময় নামের মধ্যে সর্ব নামের যোগ থাকায় কোন বৈষয়িক ও অন্যতর কার্য উপলক্ষ করিয়াই নাম রাজ্য ফুটিয়া উঠে। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই আনন্দের হাট বসিত। ভক্তগণও এই আনন্দের ভিখারী হইয়া ধর্ম লাভ ও নানা প্রকার বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের জন্য নাম প্রার্থনা করিত। তিনি প্রত্যেকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। অতঃপর অনেক দিন আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি শিলচর হইয়া অরুন্ধতী নগর প্রত্যাবর্তন করেন। আসাম হইতে অরুন্ধতী নগর আসিয়াই তিনি নিজকে সাধন সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেন। বাহিরের কোন কার্যের দিকে তিনি কোন দৃষ্টিপাত করিতেন না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেই নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ ও চৈতন্য স্বরূপ সর্ব ব্যাপী ঈশ্বরের সত্তায় অহোরাত্র নিমগ্ন থাকিতেই তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। যে কার্যের উদ্ধারার্থে তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া মর্তে আগমন করিয়াছিলেন সেই মিশনের সাধনায় তিনি সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। শ্রী আনন্দও বলিয়াছিলেন সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্তে যে বিশেষ ব্যক্তি আসিবেন। ইহ পরলোকের মানব ও দেবতা সকলেই তাঁহাকে মান্য করিবে। সর্ব জগদ্ব্যাপী মিশনের শক্তি দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবে। স্বামিজী মহারাজের এই মহাবাক্যের অন্যথা হইতে পারে না। যতই দিন যাইবে ততই জগত মিশনের সত্য মান্য করিয়া চলিবে এবং জগতের সকল কার্য মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে জানিয়া

চিরকাল সকলেই মিশনকে বরণ করিয়া লইবে। মিশনের সাধনার শক্তি বলেই ইহ পরলোকের মানব ও দেবতা অনন্ত কাল চির শান্তি লাভ করিবে-ইহাই জীবন মুক্তির কার্য মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

শেষ ভ্রমণ

১৩৬৬ বাংলা সনের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ অরুন্ধতী নগর হইতে ভোলাচং মিশন বাড়ীতে আগমন করেন। ইহাই বাংলাদেশে তাঁহার শেষ ভ্রমণ। শ্রীশ্রী মাও এ ভ্রমণে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বহু মিশন সভ্য তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে মিশন বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অরুণ কুমার সিংহ রায়, নলিনী কান্ত লোধ ও কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট মিশন সভ্য মিশনের যাবতীয় আলোচনার জন্য মিশন বাড়ীতে সমবেত হয়েছিলেন। সভা সমিতি, ধর্মালোচনা, উপাসনা এবং প্রচার কার্য অহরহ চলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব লইয়াই মিশনের কাজ করিতে হইবে। মিশন জগত লইয়াই কার্য করিবে এজন্য বহু অর্থেরও প্রয়োজন। চাঁদা দান সংগ্রহ করিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি না হইলে আশ্রমাদির উপকার হইতে পারেনা। মিশনের উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত প্রচারকের বিশেষ প্রয়োজন। মিশন যতই প্রচার কার্যে অগ্রসর হইবে ততই অর্থবলও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তোমরা সকলেই মিশনের উন্নতির জন্য প্রস্তুত হও।

তারপর তিনি মিশনের ৩ বৎসরের হিসাব পত্র পরিদর্শন করেন। অফিসের যাবতীয় হিসাব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করেন। হিসাবে তিনি দেখিলেন হিসাব পত্র ঠিক ভাবে লেখা হইতেছে ও মিশনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ৩ বৎসরের মিশনের কার্যের শৃঙ্খলা ও আয় উন্নতি দেখিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। মিশন উন্নতির পথে দাঁড়াইতেছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। কিছুদিন ভোলাচং মিশন বাড়ীতে থাকিয়া কাঁঠালিয়া মনোমোহন আশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি সর্ব ধর্ম মতে তাঁহার এক নাত্নীর বিবাহ সমাধা করেন। আশ্রমের সমস্ত কার্য পদ্ধতি দেখিয়া আশ্রম কর্তৃপক্ষকে বহু উপদেশ দিয়া আবার ভোলাচং মিশন বাড়ীতে পদার্পণ করেন। অতঃপর তিনি সদলবলে বরকাতা আনন্দ আশ্রমে গমন করেন। তাঁহার আগমন বার্তাশ্রবণ করিয়া বহু মিশন সভ্য আশ্রমে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করেন। এখানে কিছু মিশনের কাজ করিয়া তিনি কমলাপুর অশোক আশ্রমে গমন করেন। তথায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া কেন্দ্রের সর্ব ধর্মার্থীগণ ভজনের নাম গ্রহণ করেন। আশ্রমে অনেক প্রচার কার্য শেষ করিয়া তিনি আবার ভোলাচং মিশন বাড়ীতে চলিয়া আসেন। ভোলাচং আসিয়াই তিনি কালীকচ্ছ শ্রীআনন্দ ধাম দর্শন করিবার মনস্থ করিলেন। মিশন সভ্যগণ তাঁহার কালীকচ্ছ যাত্রার খবর জানিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে কালীকচ্ছ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর ১৩৬৬ বাংলা ২৮শে ফাল্গুন শ্রীশ্রী মা ও বহু

ভক্ত লইয়া কালীকচ্ছ মহাতির্থে যাত্রা করিলেন। ঠিক সন্ধ্যা সময় তিনি ভক্তবৃন্দ সমবিভ্যাহারে ব্রহ্ম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং সিদ্ধির কোঠায় বিশ্রামাগার নিদিষ্ট করিয়া লইলেন। বহুলোক সমাগম হওয়ায় প্রেমতীর্থ আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। সন্ধ্যারতির পর উপাসনা হইল। তৎপর সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে সঙ্গীতজ্ঞগণ বহু আনন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করিলেন। মহা আনন্দেই রাত্রির অবসান হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আরতির পর শ্রীশ্রীকর্তা মহারাজ গাছতলা মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপর মন্দির সংলগ্ন বারান্দায় উপবেশন করিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রী আনন্দের সমাধি মন্দিরে প্রণাম করিয়া শ্রী গুরুর চরণ দর্শন করিলেন। তিনি সকলকেই ভোগের জন্য কিছু দান করিতে আদেশ দিলেন। মিশন সভ্যগণ আনন্দের সহিত অনেক টাকা দান করিলেন। হিসাব লিখিয়াই আমরা ভোগের টাকা গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিনের ভোগের সমস্ত খরচ শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ দিয়াছিলেন। শ্রী শ্রী মা ও ভোগের জন্য একশত টাকা দান করিলেন। দয়াময় বাড়ীর পশ্চিম দিকের বড় দীঘি হইতে অনেক বড় বড় রুই কাতলা মাছ পাওয়া গেল। দয়াময়ের ইচ্ছায় ভোগের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণেই সংগৃহীত হইল। ভোগাদি বিধি ব্যবস্থার জন্য দুই দিন পূর্বেই ভোলাচং মিশন হইতে কিছু সংখ্যক লোক প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ পত্র সহ কালীকচ্ছ প্রেরিত হইয়াছিল। মহা সমারোহে ভোগ রাগ, উপাসনা, সঙ্গীত, সভা সমিতির যাবতীয় কার্য চলতে

লাগিল। সর্ব ধর্মোৎসবের যাবতীয় কার্যই পরিদৃষ্ট হইল। স্থানীয় অনেক লোক সমাগম হইল। শ্রী আনন্দ পীঠে আজ প্রেমানন্দ সকলের হৃদয়ে অলক্ষ্যে জাগিয়া উঠিল। আনন্দ ধাম আজ আনন্দের মহা মেলায় পরিণত হইয়া উঠিল। এমন আনন্দ জীবনে উপভোগ করি নাই। শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ ৩দিন এখানে থাকিয়া বহু সাধন ভজন করেন। আরতি, উপাসনা, ধর্মালোচনা জল শ্রোতের মত চলিতে লাগিল এবং স্থানীয় বিশিষ্ট লোক জন লইয়া কালীকচ্ছ মহারাজ বাড়ী উদ্ধারের বহু আলোচনা হইয়াছিল। কালীকচ্ছ যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিন কালীকচ্ছ গ্রামের অনেক বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজকে মহাপুরুষ জ্ঞানে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মিশন এই পীঠস্থান উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন জানিয়া গ্রামবাসীগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। এ জন্য কালীকচ্ছ গ্রামের ২জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় দাঁড়াইয়া দয়াময় বাড়ীর ধর্মের গৌরব ও মহিমা সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন। তাঁহারা আরও বলিলেন এই বাড়ী কালীকচ্ছ গ্রামের ও দেশের গৌরব স্থান-ইহা তিন মহাপুরুষের বাড়ী। বর্তমানে এই বাড়ীর মালিক যাহারা তাহারা সকলেই প্রায় অনেক বৎসর পূর্বে ভিন্ন রাষ্ট্রে চলিয়া গিয়াছেন। এ বাড়ীর বর্তমান মালিকগণ কেহই এখানে আসেন না এবং বাড়ীর কোন খোঁজ খবর নেন না। বক্তাগণ বলিলেন এই ধর্ম স্থান উদ্ধার করা গ্রাম-বাসীগণের কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে যাহারা আছেন তাহারা দুর্বল বলিয়া এ বাড়ী উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিতে

পারিতেছেন না। যদি মিশন এই বাড়ী উদ্ধার করিয়া দেয় আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব। তদুত্তরে শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ বলিলেন-এ পীঠস্থান উদ্ধার করা আমাদের সক্ষম। আমরা আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি। তিনি আরও বলিলেন যাহারা এই পবিত্র ভূমি দখল করিতেছে তাহারা সক্ষম হইবে না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সময় মত এই বাড়ী উদ্ধার হইবেই। সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার এই আশ্বাস বাণী শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হইলেন। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

তৃতীয় দিবসও আরতি, উপাসনা, সঙ্গীত, ধর্মালোচনা, ভোগ রাগ ইত্যাদি অনুষ্কণ চলিতে লাগিল। সেদিনও তিনি কি ভাবে আনন্দ পুরী উদ্ধার হইতে পারে মিশন সভ্য ও স্থানীয় কতক লোক লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছিলেন। ত্রিরাত্র বাস করিয়া তিনি সঙ্গীদের লইয়া ১লা চৈত্র অরুন্ধতী নগর প্রস্থান করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি অরুণ বাবু, নলিনী বাবু, কৃষ্ণ বাবু এবং আমাদিগকেও এক দিন থাকিয়া দয়াময় বাড়ী পর্য্যবেক্ষণের জন্য কালীকচ্ছের কিছু লোক লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ মত আমরাও একদিন থাকিয়া স্থানীয় কয়েক জন লোক লইয়া একটা “আনন্দ ভবন তদন্ত কমিটি” গঠন করিয়াছিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

পরলোক জয়যাত্রা

বাংলাদেশে ভ্রমণ শেষ করিয়াই শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ তাঁহার শেষ জীবনের ৫/৬ বৎসর অরুন্ধতী নগর থাকিয়াই সাধন সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বহির্জগতের দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার কার্য প্রণালী দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে দিশেহারা বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি বিবেকীর মত হইয়া সাধন সমুদ্রে ডুব দিয়া থাকিতেন। সময় সময় তিনি বলিতেন শ্রী আনন্দের কার্যই জগতের আদর্শ এবং এই আদর্শ জগত বুঝিতে পারে তাহার আদর্শ লইয়া কার্য করিয়া জগতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং সকলেই এক নামে দীক্ষিত হইয়া জীবনের আশা সফল করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই মিশন হইয়াছে। তিনি আরও বলিতেন তিনি মিশন সাধনা নিয়া জগতে পারি দিয়া উঠিয়াছেন। চির দিনের জন্য মিশনের কার্য উদ্ধার হইয়াছে। জগতের সকল নরনারী মিশনের ভিতরে আসিয়াই সাধন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। জগত মিশনের করতলে আসিবে। ধ্যানই তাঁহার জীবনের পরম সাধন ছিল। প্রাত্যহিক উপাসনার কার্যও তিনি সঙ্গীদের লইয়া নিয়মিত ভাবে করিতেন। শেষ জীবনের ২/৩ বৎসর তিনি রোজ বিকালে মহাভারত পাঠ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেন। রবিবাসরীয় উপাসনার কার্যও তিনি প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৩টার

সময় নিয়মিত ভাবে করিতেন। নিয়মানুবর্তিতা লইয়াই তিনি নিশি দিবা সাধনার কার্য করিতেন।

লীলা সংবরণের প্রায় ৩৬৫সর পূর্ব হইতেই তিনি কালীকচ্ছ শ্রী আনন্দ ধাম উদ্ধারের জন্য রোজই আশ্রমের সকলকে নিয়মিত ভাবে নাম জপ করিতে দিতেন এবং তিনি নিজেও এজন্য বহু সাধন করিয়া গিয়াছেন।

জীবন অবসানের সময় যতই ঘনাইতে লাগিল ততই শ্রীগুরু পরলোক জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের প্রায় ১ বৎসর পূর্বে তাঁহার শরীরের অবস্থা ও কার্য প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম তিনি আর ইহলোকে থাকিবেন না। প্রথমতঃ তাঁহাকে কিছু বলিতেও সাহস পাইলাম না। অনেক চিন্তার পর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা আপনি কি সত্ত্বরই পরলোক গমনের প্রস্তুতি নিতেছেন? তিনি বলিলেন না। আমি আবার বলিলাম প্রতিদিন উপাসনার সময় “প্রেম নগরে উঠল ধ্বনি দিনত বয়ে যায় থাকবনা আর এ সংসারে মিছা জঞ্জাল মায়ায়।” সর্ব ধর্মের এই সঙ্গীত শুনিতে পাই। এতে মনে হয় আপনি পরলোক গমনে প্রস্তুত হইতেছেন। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন এই সঙ্গীতের সুর বড় মধুর। তখন বুঝিতে পারিলাম সত্য খবর জানিতে পারিলে আমরা অস্থির হইয়া পড়িব এজন্য তিনি সব গোপন রাখিয়া যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছেন। বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলাম। ক্রমেই তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

হইতে লাগিল। (সর্বদা তিনি অন্তর্মুখীন হইয়া থাকিতেন। স্বপ্নাহার ফলের রস ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতেন না। যাহারা তাঁহার সেবা করিতেন তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিতনা) মন সর্বদা অন্তর্মুখীন। তখন ও উপাসনা গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতেন। কোন দিন উপাসনার শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় সঙ্গীদিগকে তাঁহার বাস গৃহ দেখাইয়া বলিতেন এই ঘর বাড়ী কাহার? তাহারা বলিত এই ঘর বাড়ী আপনার। তিনি বলিতেন ইহা আমার বাড়ী নহে। আমার বাড়ী কালীকচ্ছ। কোন দিন বলিতেন আমার বাড়ী ভোলাচং। শিশুর মত সব কথা বলিতেন।

তারপর তিনি এক মাস রোজ উপাসনার সময় বিভিন্ন প্রকারের ফল মিষ্টি দিয়া ভোগ দিতেন। কোন দিন বলিতেন আজ উপাসনার সময় অমুক দেবতা আসিবেন। সুতরাং ভোগও আদেশ মত দিতে হইত। কোন সময় বলিতেন আজ অমুক মহাপুরুষ আসিবেন এজন্য উৎকৃষ্ট ফলের প্রয়োজন। কোন দিন বা রান্না করিয়াও উপাসনায় ভোগের ব্যবস্থা করিতে হইত। ভোগের পরিমাণ ও বলিয়া দিতেন। এ ভাবে এক মাস ভোগ রাগ উপাসনা নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। উৎসবের মধ্যে যেমন আরতি, ভোগ, উপাসনা সঙ্গীত ও জপাদি কার্য অবিরাম চলিতে থাকে তেমনি উৎসবের যাবতীয় কার্য একমাস চলিতে লাগিল। ইহাতে বহু লোকের সমাগমের ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া কেহই উৎসব চলিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। দয়াময়ের অপূর্ব

লীলা কেহই বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার মহা প্রয়াণের সময় আমরা দূরে ছিলাম ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। তাঁহার লীলা সংবরণের পর আমরা এসব খবর অবগত হইয়া বুঝিলাম তিনি একমাস উৎসব ঠিক মতই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পূর্বের কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাদেরকে বলিয়া ছিলেন যখন একমাস ব্যাপিয়া একটি উৎসব হইবে তখন আমার পরলোক যাওয়ার সময় হইয়াছে জানিবে। তাঁহার কথা বৃথা হইতে পারে না। এক মাস উৎসব করিয়া ১৩৭৩ বাংলা ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃ কালে উপাসনা শেষ করিয়া শ্রী শ্রী কর্তা মহারাজ শয্যা গ্রহণ করেন। শেষ শয্যা গ্রহণের পর শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না। বহু লোক তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিত। তাহাদিগকে দরজায় দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে হইত। অন্তিম জীবনের শেষ ৩দিন তিনি কাহারো সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করেন নাই, গাঢ় নিদ্রাভিভূতের মত থাকিতেন। অনন্ত ধামের যাত্রী অনন্তের দিকে ছুটিয়া মহা সমাধির জন্য প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে ১৩৭৩ বাংলা সনের ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ ভবলীলা সাজ করিয়া আনন্দ জগত বাসী হইলেন। পরদিন ৩টার সময় অরুন্ধতী নগর হাইরমারা টিলা ও অন্যান্য স্থানের ভক্তবৃন্দ তাঁহার শব দেহ লইয়া পরিক্রমা করেন ও রাত্রি ৯টার সময় গোল (টিলার) ঠিক মধ্য স্থানে তাঁহার পুতদেহ মহা সমারোহে সমাহিত করেন। শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজের লীলা সংবরণের ৩দিন পূর্ব হইতে শ্রীশ্রী মাতা ঠাকুরাণী প্রবল জ্বরে শয্যাগত ছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সর্ব ধর্মের মূল কথা

মিশন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বলিতেন মিশন জগত লইয়া কার্য করিবে। জগতে যত প্রকার কার্য আছে মিশনের ভিতর দিয়াই সকল প্রকার কার্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে। জগত মুক্তির কার্য ও মিশন সাধনার ভিতর দিয়া উদ্ধার হইবে। মিশন সাধনার মধ্যে তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কিছু বর্ণনা (উপাসনার বাণী) উদ্ধৃত করা হইল।

মিশন সাধনা

- ১। সাধন সম্পর্কে শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের মধ্যেই জীবনের কার্যে সফলতা আবশ্যিক এবং এই মহাপুরুষের যোগ না পাইলে কখনও জীবনমুক্তির আশা পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব জানিবে সর্বোপরি শ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের দয়াই সকলের সাধন সিদ্ধির এক মাত্র উপায় হইবে। জগত বাসীর মুক্তির রাস্তা যিনি করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা সাধনের পরিপূর্ণ আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য করিব। ইহাতেই শান্তি আসিবে-সকল আশা পূর্ণ হইবে।
- ২। যে ধর্ম মণ্ডলীর কার্য উদ্ধার কল্পে মিশন গড়িয়া উঠিতেছে সেই মণ্ডলীর মূলে একজন মহাপুরুষ আছেন।

তিনি এই মিশনের প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।
এজন্য ইহা কোন দিন নষ্ট হইতে পারে না।

- ৩। তুমি ঈশ্বর সাধন করিতে মনে করিয়াছিলে এ নিমিত্ত
মিশন সেবাই তাঁহার সাধন জানিবে। অতএব স্বামী স্ত্রী
জীবন সংশোধন করিতে অবিরাম বিশেষ প্রকারে প্রয়াস
পাইবে। মান সম্বন্ধ বিষয় আশয় ছাড়িয়া জীবের হিতে
সাধন করিবে। মনে রাখিবে প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াই
তোমার উপর মিশনের ভার প্রকাশিত হইয়াছে। সাধ্য
মত কার্য করিবে জানিয়া তোমার প্রতি সত্য প্রচারিত
হইয়াছে। নাম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তুমি আদর্শের
অনুমতি লইয়া চলিবে। তুমি বিষয়ীদের সঙ্গে বাস
করিবে না। তাহাদের কার্য তোমার নাই জানিবে কিন্তু
বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে সংসারীদের কার্যের বিশেষ
ব্যবস্থা করিবে। নামের শক্তিতে বিশ্বাস রাখিবে। নামে
জীবের সকল কষ্ট ঘুচিবে-ইহাই মিশন সেবা।
- ৪। দুইটি ব্যাপার এখন আজ হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে।
একজন মহাকালী নামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার্থে কার্য
করিবেন এবং আর একজন শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী
মহারাজের আদর্শ নিয়া কার্য করিবেন। উভয়ের কার্যই
এখন আদর্শ হইয়া মিশনের জন্য নামের লোকদিগকে
একত্র করিবে। অর্থাৎ আজ হইতে ইহ পরলোক একত্র
হইয়া জীবনুজ্জ্বল কার্য করিবে। অদ্যাবধি দয়াময়ের

কার্য করিবার নিমিত্তে জগতের মহাপুরুষ সকলেই
সাধনে ব্রতী হইবেন। সুতরাং সদয় নিদয় উভয় ভাবে
জগতের মধ্যে শান্তির সুসমাচার দয়াময় প্রকাশ
করিলেন।

- ৫। জয় দয়াময় নামের কার্য শেষ হইয়া গেল। এজন্য
অদ্যাবধি শুধু দয়াময় নামের কার্যই সর্বতোভাবে আদর্শ
হইবার কার্য দিবার সিদ্ধি আনয়ন করিল। সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয় এখন আর নামেতে কোন রকমের অন্তরের বিকল্প
অবস্থা আনিতে পারিবে না।
- ৬। ভ্রাতৃদেব সকলের জন্যই উপস্থিত হইয়া গেল।
পৃথিবীতে কেহই নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া সুখে
থাকিতে পারিবে না। কারণ জগতের মধ্যে এখন ষোল
আনা কার্য সকলের সহিত যোগে উদ্ধার হইবে।
ব্যক্তিগত স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।
- ৭। সর্ব মঙ্গলাধার ঈশ্বরের সহিত মনের পূর্ণ মিলন-জীবের
সহিত নিজের একতা বোধ-সংসার বিলাসের মধ্যে
মনের নির্বেদ-ধর্মের হিসাবে মিশনের মধ্যে জীবন
উৎসর্গ করিবার ঐকান্তিক অনুরাগ সদয় নিদয় উভয়
ভাবের মধ্যে মাতৃভাব এই কয়েকটি সাধন প্রতিষ্ঠাতেই
মিশনের উপযোগী স্বামিত্ব জানিবে।

- ৮। মিশনের বাহিরে আর কেহ তিষ্ঠিতে পারিবে না। দুদিন আগপর সকলেই মিশনের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে।
- ৯। সর্ব ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগত এক হইতে চলিয়াছে ও সকলের মধ্যে সাধন দেখা দিয়াছে। নারায়ণ, কঙ্কি, ইমাম মেহেদী খানেন্দরজাল প্রভৃতি সকল আদর্শ কার্য করিতে পারে তাঁহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। অশান্তির বৃদ্ধি দ্বারাই একতার উপলব্ধি হইবে।
- ১০। জগতের মঙ্গলার্থে কার্য করিতে না পারিলে কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারিবে না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং যত অশান্তির কার্য আবশ্যক ছিল তাহা শেষ হইয়া যাইতেছে।
- ১১। সর্ব ধর্ম মিশন চিরকালের জন্যই সিদ্ধ যোগে আবির্ভূত হইল। কেহই আর মিশন ভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কেহই আর জন সাধারণের কার্যে জীবন উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিল না। কেবল সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া গেল।
- ১২। জগতে জীবন মুক্তির কার্য উদ্ধারার্থে মিশন আবির্ভূত হইয়াছে। মিশনের কার্য অবহেলা করিলে জগতের প্রতি অবহেলা করা হয় এবং জগতের কর্তা একমাত্র দয়াময়ের প্রতি অন্যায় করা হইয়া থাকে।

- ১৩। অদ্যাবধি ৩৬ হাজার নামের কার্য মিশনের সকল ব্যাপারেই সকল প্রকারে পরিষ্কার রকমে চিরকালের নিমিত্ত স্থিরীভূত হইয়াছে। জগত করতলে আসিতে পারে ইহার প্রতিকার পাওয়া গিয়াছে।
- ১৪। জগতের মধ্যে সাধন বিনা কিছুই লাভ হইবে না। সাধন দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। জীবনের কার্য সর্বতোভাবে সাব্যস্ত করিতে হইলে সর্বদা সাধন করিয়া যাইবে।
- ১৫। দয়াময়ের প্রতিষ্ঠাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে স্বাভাবিক ভাবে জগতের অভাব অভিযোগ আসিবেই আসিবে এবং শেষ যোগে সমুদয় যন্ত্রণার অবসান হইবে। এতএব মিশনের উপায় নামেতে স্থায়ী ভাবে হইলেই আমাদের আর কষ্টের কারণ থাকিবে না।
- ১৬। ধন দৌলত দ্বারাই এই অশান্তি সর্বত্র সকলের মধ্যে জীবন সংশয়াকুল করিতেছে। সুতরাং এই ধন দৌলতের প্রভাব না থাকে এইরূপ সময় দেখা দিতেছে। এরূপ দিন আসিতেছে যে দিনে কেহই আর বিত্ত অর্থের সন্ধান করিবে না। প্রকৃত মনুষ্যত্বই জীবনের মান দণ্ড হইবে। সকলেই সাধনের নিমিত্তে কার্য করিতে স্বার্থত্যাগ করিবে।

- ১৭। আমরা প্রত্যেকেই নিজের ভাবের প্রতিষ্ঠার্থে অন্যের ভাবের বিচার করি। ইহাই আমাদের অশান্তির হেতু জানিবে। জগতের মধ্যে আমাদের কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই শান্তির কথা।
- ১৮। মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল সকলে মিলিত হইয়া এরূপ একটি সজ্জ স্থাপন করা যে সজ্জের মধ্যে সকল জাতি স্থান পাইবে এবং দয়াময়ের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে জীবনুজ্জির আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।
- ১৯। জগতের মধ্যে কোন বিষয় মিশনের বাহিরে থাকিতে পারিল না।
- ২০। দয়াময় নামেতে একটি উপায় আসিল। যারা অন্বেষণ করিবে-কথামত কার্য্য করিবে-মিশনের ব্যবস্থা মান্য করিবে-তারা উপায় প্রাপ্ত হইবে।
- ২১। মিশনকে দয়াময় লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।
- ২২। মিশনকে জগতের জীবন বলা যায়।
- ২৩। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন-দয়াময় নামের বাহন।
- ২৪। নির্দোষ জীবন হাসিল হইলেই মিশনের অভাব শেষ হইতে পারে।
- ২৫। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের কার্য্য এই যে ইহা প্রত্যেকের জীবনে সাধন পথ সুন্দর ও সহজ করিয়া তুলিবে। সাধন পথের কন্টক দূর করিয়া শান্তি আনয়ন করিবে।

- ২৬। জীবনুজ্জির সোপানে আরোহন করিবার নিমিত্ত অগ্রে আর্থিক কষ্টের নিবারণ অতি আবশ্যিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।
- ২৭। যে ধর্ম্মের কার্য্য করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের উৎপত্তির প্রয়োজন হইয়াছে সে ধর্ম্ম নিয়াই পৃথিবীতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সকলেই এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সফল করিবে।
- ২৮। চির দিনের জন্য মিশনেতে আয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
- ২৯। ছত্রিশ হাজার আদর্শের মধ্যেই উপাসনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মের হিসাবেও আমাদের কার্য্যের ফের গিয়াছে। উপায়ের হিসাবেও মিশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।
- ৩০। জীবনের মধ্যে একবার অন্ততঃ দিব্যাত্মিকের মধ্যে সস্ত্রীক সাধনের নিয়ম পালিবে। মনের প্রতিষ্ঠাই জীবনের প্রতিষ্ঠা। জয়দূর্গা দেবীতে মিশনের নিভরসা সিদ্ধির কার্য্যেতে সিদ্ধ যোগ হইয়াছে।
- ৩১। বাণী দর্শনাধিকার বিশেষ ভাবে লাভ করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা বিশেষ প্রকারে আবশ্যিক।
- ৩২। কেবল গৃহীণীকে সজ্জিনী করিতে পারিলেই কার্য্যের সুসার হইয়াছে দেখিবে।
- ৩৩। সর্ব্ব দেবতার যোগে সিদ্ধ আসিয়াছে। অতএব মিশনের স্ত্রী পুরুষ এক যোগে মিশনের প্রতিষ্ঠার্থে যত্ন করিবে। অরি দমনের যোগেতেই আমাদের সিদ্ধির প্রয়োজন।

- ৩৪। মনের যোগেই আমাদের জীবনের কার্য চলিয়াছে। মনের মলিনতা গেলে দেখিতে পাইব আমাদের জীবনের প্রত্যেক ভাবেও কার্য্য এক ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে। মনের যোগে শেষ হইলেই আমরা দেখি আমরা ঈশ্বরের সাধিত সম্পূর্ণ অপৃথক।
- ৩৫। ভাল মন্দ হিসাব ছাড়িয়া দিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিত ভাবে ঈশ্বরের চিন্তা সাধন করিতে পারিলেই সব হাসিল হইবে।
- ৩৬। সকল কার্য্যই ঈশ্বর সেবা-ইহাই সিদ্ধ যোগ।
- ৩৭। জীবিকার জন্য এবং সাধনের জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিত কার্য্য করিবে।
- ৩৮। সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও জগতকে লইয়া কার্য্য করিলেই মিশন সেবাতে জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়।
- ৩৯। একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষের মধ্যে জগতের সমুদয় অধিকার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যেই মিশনের ষোল আনা যোগ আছে।
- ৪০। সিদ্ধ ব্যক্তিদের শক্তিতেই মিশনের অভাবের শোধন হইবে।
- ৪১। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন মুক্তির সাধন উপস্থিত করিবে। তারপর দয়াময় সাধন পূর্ণ করিবে।

- ৪২। মহাকালী এবং দয়াময় ইহারাই মিশনের প্রকৃত আদর্শ। এই পথে ত্রিভুবন আসিয়া মিলিবে। এই উভয়ের মধ্যে ৩৬ হাজার আদর্শ রহিয়াছে।
- ৪৩। মিশনের কার্য্য দয়াময়ের কার্য্য, ইহা এক ভিন্ন দুই নহে।
- ৪৪। যে নামের কার্য্য করিতে শ্রীমৎ স্বামিজী আসিয়াছিলেন সেই নামের প্রতিষ্ঠার জন্যই মিশন হইয়াছে।
- ৪৫। দয়াময়ের কার্য্য মিশনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। মিশনের ভিতর দিয়াই দয়াময়ের নামের কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।
- ৪৬। মিশনের সহিত জীবন সংযোগ কর। সকল প্রতিকার করতলে আসিবে। ইহার জন্য যতই স্বার্থ ত্যাগ করিবে ততই সাধনের উন্নতির অবস্থা আসিবে।
- ৪৭। যে ব্যক্তি মিশনের সভ্য হইবে তাহার মধ্যে সর্ব্ব যোগ উপস্থিত হইবে। তাহার কার্য্য সিদ্ধ যোগ স্থাপিত হইবে। সুতরাং মিশন ফন্ডের মধ্যেই সকলে সাধন প্রাপ্ত হইবে।
- ৪৮। মিশনের চিন্তা যাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতেই জগদ্বাসীর হিতার্থে সাধন উপস্থিত হইয়াছে।
- ৪৯। কেহই আর অপরকে হয় মনে করিতে পারিবে না। সকলেই এক পিতার সন্তান এই কথা জানিয়া সাধন করিবে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিমিত্তে সর্ব্বস্ব বিসর্জন করিবে।

- ৫০। শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুসারেই সর্ব ধর্ম মিশন উদ্ধার হইয়াছে।
- ৫১। নামের কার্যের মধ্যে সর্বাত্মে কেবল ভক্তির প্রয়োজন।
- ৫২। দয়াময়ের নাম দ্বারা দীক্ষা দেওয়া সার কথা।
- ৫৩। জীবনুজ্জ্বলিত আসরে এখন সকলেই নামিতে বাধ্য হইল। ইহ পরলোকের এমন কেহ নাই যে মিশনের সাথে সংযোগ সাধনে ব্রতী না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে। রোগ, শোক ও মৃত্যুর কার্য উপস্থিত হইল।
- ৫৪। জগতের কথা হৃদয়ে জানিবার অধিকার পাইলেই সাধকের জীবন পথ সুগম হয় এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তিতা লাভ হইতে পারে।
- ৫৫। একজন ত্রিদিব বিজয়ী পুরুষের কার্য আসিল। তিনি ইহলোকে যেমন পরলোকেও তেমন প্রত্যেকের সাধন পূর্ণ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া সকলের উপায় করিল।
- ৫৬। ইমান মেহেদীকে আমরা মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মনে করিব। তিনি মিশনের সর্ব বিষয়ের উপায় করিবেন। তাঁহার ভিতর দিয়াই ধরাতলে সর্ব জাতির মহামিলন সাধিত হইবে।
- ৫৭। যে ব্যক্তির প্রতি মিশনের কার্যভার অর্পিত হইয়াছে সেই ব্যক্তির নামেই মিশন চিরকাল কার্য করিবে। ইহার

- মধ্যেই বিত্ত অর্থ নিয়া সাধন পূর্ণ হইবে। মিশনের সাধন এই ব্যক্তি ভিন্ন কেহ করিবে না।
- ৫৮। শ্রী আনন্দের কার্য মিশনের কার্য।
- ৫৯। দয়াময় আজ মিশনের সাথে মিশিলেন। ১১ পৌষ ১৩৩৪ বাংলা
- ৬০। ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া কার্য করেন। আমরা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে যন্ত্রবৎ চালিত হইতে থাকি।
- ৬১। আজ মানব ও দেবতা সকলেই মিশনের কার্য ভার লইয়া হাজির হইল এবং নিদয় সদয় উভয় প্রকারেই মিশনের সাধনায় বিশুদ্ধ রাজপথ বাহির হইল।
- ৬২। মিশনের সমস্ত কার্যের ভার দয়াময় গ্রহণ করিয়াছে।
- ৬৩। সত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মিশন জগতের ভার লইয়াছে।
- ৬৪। সর্ব নামের সেবা জগতের সেবা এবং মিশনের সেবা এক জানিয়া কার্য করিবে।
- ৬৫। জীবন মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতেই মিশন হইয়াছে।
- ৬৬। মিশনের কার্য না করিয়া এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ও ইহার সেবা না করিয়া কেহই সাধন পাইবে না।
- ৬৭। জগতের কার্য নিয়া মিশন আবির্ভূত হইয়াছে। ২৫প্রকারের সাধকতার কার্যও এখন হইতে মিশনের ভিতর দিয়া প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারিবে।

- ৬৮। আজ দয়াময় রাজ্য নিয়া মিশনের কার্য পূর্ণভাবে সাব্যস্ত হইল। দয়াময়ের কার্য মিশনের ভিতর আবির্ভূত হইল এবং মিশনের ভিতর দিয়াই দয়াময়ের নামের কার্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।
- ৬৯। মিশনের প্রত্যেক সভ্য সর্বদা দয়াময় নাম সাধন করিলে সাধন পাইবে। জগতে এখন সাধন না করিয়া কেহ চলিতে পারিবে না।
- ৭০। জগতের উপায় করাই মিশনের কার্য।
- ৭১। জগতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্যই মিশনের সৃষ্টি।
- ৭২। ঈশ্বরের সহিত যেমন জগত অগ্রসর হইতেছে তোমারও প্রয়োজন জগতের সহিত সর্বতোভাবে সংযোগ রক্ষা করা। এই জন্যই মিশনের সৃষ্টি।
- ৭৩। মিশনের সকল কার্যের মূলে কে আছেন পরিজ্ঞাত হও। সর্ব ধর্ম মিশন এই নামের শক্তি ও গৌরব সর্বাত্মে ধর্মালোচনার ভিতর দিয়া উপলব্ধি কর। ইহার শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে মাতিয়া উঠিবে।
- ৭৪। মিশন ৩টি কাজ করিবে।
- ক) সকল ধর্ম সিদ্ধযোগে মিলিত হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য মিশন কার্য করিবে।
- খ) জাতিগত অনৈক্য না থাকে ইহাই কার্য ক্ষেত্রে মিশনের উদ্দেশ্য হইবে।
- গ) ইহ পরলোক সর্বত্র দয়াময় নামই জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ।
- ৭৫। মিশনের আইনগুলি কাহারো কল্পনা সম্ভূত নহে।

আশ্রম সাধনা

- ১। সর্ব ধর্ম মিশনের যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে আশ্রম সমূহ স্থাপিত হইয়াছে।
- ২। সর্ব ধর্ম মিশন মুক্তির নিমিত্ত কার্য করিবে। এই মুক্তির সাধনা নিয়াই প্রতি আশ্রম স্বীয় লোকবল, অর্থবল ও সাধন বল প্রভৃতি লাভ করিবে।
- ৩। আশ্রমের ভার যে লইবে তাঁহার জীবন ধর্মার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি স্বীয় অভিপ্রায়নুসারে কার্য করিতে পারিবে না। মিশনের নির্দেশ মানিয়া তাঁহার কার্য করিতে হইবে।
- ৪। সহকারী যে দুইজন হইবে তাহাদের জীবনও মিশনের উদ্দেশ্য লইয়া গড়িয়া উঠিতেছে তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই সম্পাদক কার্য করিবেন।
- ৫। সর্ব ধর্ম মিশনকে সর্বতোভাবে প্রত্যেকে আশ্রম সাহায্য করিবে। আশ্রম সমূহ মিশনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে রাখিবে।
- ৬। মিশনের যাবতীয় আইন কানুন প্রত্যেক আশ্রম মান্য করিয়া চলিবে।
- ৭। আশ্রমগুলি মিশনের মূল অফিস। সেই আশ্রম হইতেই সকল কার্য মিশনের জন্য সন্ধ্যেরা করিবে।
- ৮। আশ্রমের নিয়ম প্রণালী সম্পাদক রচনা করিবে। কিন্তু মিশনের পরিচালক সমিতি মঞ্জুর করিলেই উহা কার্যকর

হইবে। সর্বদা স্থানীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিবে।

- ৯। মিশন ইচ্ছা করিলে কার্যকরী মন্তব্য অনুসারে সাধারণ সভায় উক্ত নিয়মাদি রদ বদল বা পরিবর্তন কিংবা আমূল সংশোধন কিংবা নূতন নিয়ম করিতে পারিবেন।
- ১০। আশ্রমে কেহ কোন দিন অবান্তর আলোচনা করিতে পারিবে না। প্রত্যহ আরতি ও ভোগ রাগ যথারীতি দিতে হইবে। উপাসনার ব্যবস্থা গুরুজী করিবেন।
- ১১। সাধন ভজন আশ্রমের প্রধান কার্য হইবে।
- ১২। সময় বিশেষ উৎসব হইবে।
- ১৩। ম্যানেজিং কমিটি মিলিয়া আশ্রমের আয়ের ব্যবস্থা করিবে।
- ১৪। আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে কেন্দ্রের প্রত্যেক সভ্যকে দান করিতে হইবে। এই দান না দিলে তাদের কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।
- ১৫। আশ্রমে সকলে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আরতিতে যোগ দিবে। সাধ্য মত আশ্রমের মধ্যে যে সমস্ত কার্য আছে তাহা করিবে। না করিলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হইবে মৃত্যু হইতে পারে।
- ১৬। যেখানে উৎসব হইবে সেখানেই উপস্থিত থাকিয়া কার্য করিবে। সাধন বা অন্য কার্য যা পার করিবে। মিশন বা

কেন্দ্রের উৎসব বুঝিবে। বৎসরে অন্ততঃ একটি উৎসবে কার্য না করিলে অভাব বৃদ্ধির কারণ আসিবে।

- ১৭। প্রত্যেক আশ্রমে রিজার্ভ ফণ্ড গঠন করিয়া লইবে। সেক্রেটারী ও সহ-সেক্রেটারী নামে পাস বই হইবে। প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা জমা দিবে।
- ১৮। আশ্রম সমূহ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে মিশনের পরামর্শ লইয়া কার্য করিবে।
- ১৯। প্রয়োজনে মিশনের কার্যের জন্য প্রেসিডেন্ট আশ্রম হইতে টাকা লইতে পারিবেন। সকল আশ্রম মিশনের অবয়ব মাত্র।
- ২০। সাত হাজার আশ্রম হইলে মিশন জগত লইয়া কার্য করিতে পারিবে।
- ২১। দয়াময়ের সর্বধাম বিশুদ্ধ ভাবে আশ্রমের মধ্যে রাখিবেন। এ স্থান জীবন মুক্তির ক্ষেত্র। ইহাতে অবিশ্বাসের কোন হেতু বিদ্যমান নাই। শান্তির প্রতিষ্ঠা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত স্বার্থে বা শক্তিতে আশ্রম স্থাপিত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ ধর্ম প্রেরণা ভিন্ন অন্যের আশ্রমের কাজ করা অসম্ভব।
- ২২। আশ্রমের জন্য মিশনের চাঁদা দান ব্যতীত অতিরিক্ত চাঁদা দান লওয়া যাইতে পারে।
- ২৩। আশ্রমে যারা পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে না তাহাদের প্রয়োজন এই যে এখানে তাহাদের বাস করা

উচিত নহে। যদি কেহ এই কথা না মানিয়া কার্য্য করিতে চায় বিপদ হইবে এমন কি মহাকালী এবং দয়াময় এই দুই নামের ভিতর দিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মিশন কর্মচারী

- ১। নাম নিয়া সাধন করিতে ব্যস্ত এবং সংসারে শৃঙ্খলা বিধানের যেমন নিজের চেষ্টা, উদ্যোগ, মিশনের উন্নতি বিধান করিতে তেমন ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা রহিয়াছে এরূপ মানুষ স্ত্রী বা পুরুষ মিশনের কর্মচারী হইতে পারে।
- ২। কর্মচারীদিগকে বেতন দেওয়া হইবে। পরিচালক সমিতি অথবা সাধারণ সভা বেতন সাব্যস্ত করিবে। যারা মিশনের কার্য্য করিবে তাদের বৎসরে এক মাস অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে। কর্মচারীদের বেতন পরবর্ত্তী মাসের ১১তারিখ দিতে হইবে।
- ৩। কর্মচারীরা বেতন লইয়া কার্য্য করিবে। তাদের পরিবার কোন দিন মিশনের মধ্যে থাকিবে না।
- ৪। পরিবার যেমন প্রিয় মিশন তদপেক্ষা প্রিয় এইকথা কর্মচারীরা জানিয়াই মিশনের কার্য্য করিবে। উপরোক্ত চারিটি নিয়ম চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল।
- ৫। মহাকালী এবং দয়াময় যাদের জীবনে প্রকাশ পাইবে তাহারাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্মচারী হইবে।

- ৬। মিশনের কর্মচারী হইলে প্রত্যেকেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে কার্য্য করিবে। নচেৎ মিশনের কার্য্য না লওয়াই সঙ্গত হইবে। বরং নানা ত্রুটির দরুন অভাব বাড়িবে ক্লেশও পাইবে।
- ৭। জগতের সেবা করিবার জন্যই মিশনে চাকুরী করিতে হইবে। সাধারণ ভাবে জীবন যাত্রা নিব্বাহের উদ্দেশ্যে বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তি ধর্ম্ম লাভের উদ্দেশ্যেই মিশনে চাকুরী লইবে। স্বার্থের উদ্দেশ্যে এখানে চাকুরী করিলে বিপদের সীমা থাকিবে না।
- ৮। মিশন কর্মচারীদের মধ্যে সাধুতার প্রকৃত শক্তির উন্মেষ হইতে পারে, বিনয়, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সদগুণ সমূহের দ্বারা জীবনের কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে ইহার বন্দোবস্ত হইল।
- ৯। যে ব্যক্তির হৃদয় মন দেহাদি সমুদয় কেবল মিশনের প্রতিষ্ঠার্থে উপকারার্থে নিয়োজিত বা উৎসর্গীকৃত হইবে সেই ব্যক্তিকেই কার্য্যের অধিকারী জানিবে।
- ১০। আজ সর্ব্বতোভাবে মিশনের কর্ণধার শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজের কার্য্যভার প্রতি কার্য্যকারীর উপর অবতীর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং সকল কার্য্যকারীদের সাধন করিয়া শক্তি লাভ করিতে হইবে।

- ১১। দয়াময়ের কার্য নিয়া যে সকল লোক বাহির হইবে তাহাদের কার্য দয়াময় স্বয়ং সর্বত্র করিবেন এই সুসমাচার উপস্থিত হইল।
- ১২। মিশনের অভাব বিমোচন এবং ইহার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা থাকিলে অচিরেই সম্ভাব্য বিনষ্ট হইবার পথ দেখিবে। জগতের কল্যাণ কল্পে নাম রীতিমত স্মরণ করা প্রয়োজন।
- ১৩। নামেতেই মিশনের সমুদয় উপায় হইবেই হইবে। নামেতে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার রহিয়াছে।
- ১৪। মিশনের বিশেষ কার্য করিতে হইলে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া উপাসনা করিবে-প্রার্থনা করিবে।
- ১৫। মিশনের চিন্তাতেই সকল প্রকারের অশান্তি দূরীভূত হইবে।
- ১৬। যারা মিশনের কর্মচারী তাদের মোট সংখ্যা তিনশত। ইহাদের মধ্যেই ৩৬জন আছে। ইহাদের মধ্যেই ১২ জন আছে এবং ইহাদের মধ্যেই ৫জন রহিয়াছে। দয়াময় প্রয়োজনানুসারেই ইহাদের নিয়া ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ পৃথক পৃথক চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেহই মিশনের পক্ষে কম উপকারী নহে। প্রত্যেকেই মিশনের এক একটি স্তম্ভ। তিনশত বিশাল স্তম্ভের উপর মিশন স্থাপিত।
- ১৭। মিশন কর্মচারীদের সংখ্যা এক লক্ষ না হইলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

- ১৮। যে সকল কর্মচারী ২৫ বৎসর মিশনে কাজ করিবে তাহারা অর্ধেক বেতন পেনশন পাইবে।
 - ১৯। প্রেসিডেন্ট মিশনের প্রধান পরিচালক। তিনি একযোগে একই প্রণালীতে এবং একই উদ্দেশ্যে আশ্রমগুলি যাতে মিশনের সাথে কার্য করিয়া চলিতে পারে তজ্জন্য সময় সময় আশ্রমগুলি পরিদর্শন করিবেন।
 - ২০। প্রেসিডেন্ট প্রচারক ও আচার্য এবং মিশনের অন্যান্য কর্মচারীও মিশনের কার্য করিয়া আদর্শ দেখাইবে। ইহারাই মিশনের জন্য সর্ব্বাঙ্গে দান করিবে।
 - ২১। যে যাহার গুরু সে তাহাকে নিয়া কার্য করিতে পারে এবং মিশনের কার্য শেষে যোগ লাভ করিতে পারে তাহার ও উপায় হইল। যাদের লইয়া মিশন নির্মিত হইতে পারে তাহাই আজ অবধি সাধন সমরে অবতীর্ণ হইয়া গেল।
- ১৯শে পৌষ ১৩৩৮ বাংলা
- ২২। মিশনের কার্য নিয়া যে ব্যক্তি সাধন করিবে ইহার প্রতিষ্ঠার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে সে-ই ঈশ্বরের করুণা সর্ব্বাঙ্গে প্রাপ্ত হইবে।
 - ২৩। কার্যকারীদিগের মধ্যে সাধন সিদ্ধির প্রতিকার করা আবশ্যিক। নতুবা লোকবল বৃদ্ধি পাইবে না। যাদের নিয়া সাধন উদ্ধার হইবে-কার্য সিদ্ধ হইবে তাদের উন্নতি না হইলে মিশনের কার্যের প্রসার হইবে না।

- ২৪। যাদের অন্তরে ধর্ম পিপাসা আছে এবং অনুরূপ কার্য করিবার সঙ্কল্প রহিয়াছে এরূপ পুরুষেরাই মিশন গঠন করিবে।
- ২৫। কেহই নিজের নিমিত্তে আর কার্য করিতে পারিবে না। সকলের পক্ষেই কেবল সর্ব ধর্ম্মানুসারে সকলের জন্য কার্য করাই আদর্শ হইবে।
- ২৬। ছত্রিশ হাজার নামেতে কর্মচারীদের মধ্যে কার্য আসিলে কেহই সাধন না করিয়া মিশনে চাকরী করিতে পারিবে না।
- ২৭। পরিচালক সমিতির সভ্যগণের জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।
- ২৮। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া কার্য না করিলে মূল সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার কাহারো থাকিবে না।
- ২৯। সর্ব ধর্ম্মের সার লক্ষ্য নিয়া যে কার্য করিবে তাহাতে ত্যাগের সাধনা ষোল আনা প্রকারে সিদ্ধ হইবে। জগতের মধ্যে এখন ত্যাগই ধর্ম্মের প্রকৃত নিদর্শন বা মানদণ্ড হইবে।
- ৩০। আর কিছুতেই মিশনের কার্য পরিচালনা নিয়া গোলযোগ করিতে পারিবে না। যদি কেহ অশান্তির উদ্বেক করিতে চাহে তদ্বারা মিশনের কোন ক্ষতি হইবে না বরং তাহার নিজের অশেষ অনিষ্ট হইবে।

চাঁদা ও দান

- ১। মিশন ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চাঁদা বা দান যাই আদায় করিতে মিশন চেষ্টা করিতেছে তাহাও স্বয়ং দয়াময়ের আদেশানুসারেই। ত্যাগের ভাব জানিলেই জীবনে মুক্তির সাধন সফল মনোরথ হইবে।
- ২। চাঁদা কিংবা দান যা তোমরা দিলে মিশন চলিতে পারে তোমরা তাহা না দিলে তোমাদের ক্ষতি আছে। মিশনের জন্য যাদের দরদ নাই যারা স্ত্রী পুত্রাদি নিয়া সংসার করিতেছে অথচ মিশনের কাজে অবহেলাই ব্যবহারে দেখাইতেছে তাদের মিশনে না থাকাই মঙ্গল।
- ৩। মিশনের প্রত্যেক মেম্বার প্রতি বৎসর ফিস (চাঁদা) দিবে। প্রতি বৎসর রীতিমত চাঁদা না দিলে মেম্বার থাকিতে পারিবে না। পৌষ মাসের উৎসবের পূর্বেই বৎসরের ষোল আনা ফিস না দিলে কেহই মেম্বার থাকিতে পারিবে না।
- ৪। চাঁদা রীতিমত দিলে আদর্শ সেবক হইবে। রীতিমত চাঁদা না দিলে সর্বার্থ সিদ্ধির কার্য পণ্ড হইয়া যায়। দান দিলে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রধান হইবে।
- ৫। চাঁদা ব্যতীত মিশনে দান করিবার বিধান আছে। এই বিধান মানিতে পারিলেই জীবনের কার্য লইয়া সাধনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে জানিবে। ইহাকে ভক্তি ভূমি বলে।

- ৬। যারা জীবনের কার্য্য ভগবানকে অর্পণ করিতে চায়, যারা এই বিধান মানিবে তাহারাই চাঁদা ব্যতীত কমপক্ষে বৎসরে আয়ের $\frac{5}{50}$ ভাগ আনন্দের সহিত মিশনে দান করিবে। ধর্ম্মের হিসাবে টোকার কম কেহই দিবে না। এর কম দিলে ক্ষতির কারণ আছে। অসমর্থ ব্যক্তি দান না দিলেও চলিবে।
- ৭। মিশন সেবাতে ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে। যারা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে নিয়া কার্য্য করেনা তাহার মিশনে দান করিতে ও পারে না। ত্যাগই ধর্ম্মের নিদর্শন বা মান দণ্ড।
- ৮। যাহারা মিশনে কার্য্য করিবে তাহারাই আগে দান করিবে।
- ৯। চাঁদা এবং দানই মিশনের উন্নতির সোপান।
- ১০। চাঁদা মিশনের মূল আর্থিক প্রতিকার। যারা ঈশ্বর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছে তাঁরা চাঁদা ব্যতীত দানও করিবে। ইহাতে জগতের কার্য্যে ইহারা সহজ ভাবে সাধন লাভ করিতে পারিবে।
- ১১। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের মধ্যে টাকা কড়ি সম্পর্কে যে যত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবে তাহাতে তত বেশি কার্য্য পথ সুগম হইবে। এই ত্যাগের কার্য্যই একমাত্র পথ এবং ইহার জন্যই সকলের জীবন গড়িয়া নিতে হইবে।
- ১২। অসমর্থ ব্যক্তি নির্দ্ধারিত ফিসের অর্ধেক দিবে।
- ১৩। চাঁদা ও দান অদ্যাবধি শেষ যোগে হাসিল হইয়া গেল।

- ১৪। মিশনের সভ্য আয়ের এক দশমাংশ মিশনে দান করিলে আশানুরূপ ফল লাভ করিবেই করিবে।
- ১৫। ঠিক মত মিশনে দান না করিলে ক্ষতি হইবে না এমন নহে।
- ১৬। মিশনের কার্য্যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বরং মিশনের কার্য্য জীবনের ব্রত করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অনেক রকম সুবিধা হইয়াছে।
- ১৭। মিশনে পুনঃভর্তি হইলে কমপক্ষে এক টাকা জরিমানা না লইয়া ভর্তি করিবে না।

সর্ব্ব সমাজ

- ১। স্বামিজী মহারাজ ১২৯২ সনের ২৪শে শ্রাবণ কলিকাতা মোকামে সর্ব্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আপন পরিবার মনে করিতেন। জগতের মুক্তির সাধনা করিয়া তিনি বলিতেন সকল জাতির বিবাহই বাহ্যিক বন্ধনের ব্যাপারে। প্রকৃত বিবাহ জগতে কার্য্যকারী ভাবে উপস্থিত না হইলে সকল জাতি লইয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না। প্রকৃত বিবাহ নিয়া সমাজ গঠিত হইলেই সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধনায় মানবগণ সফল মনোরথ হইবে।
- ২। এই মিশন হইতে আরও পরে একটি সমাজ গঠিত হইবে যে সমাজে জগতের স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া ঈশ্বর অন্বেষণ করিবে। ইহারই নাম সর্ব্ব সমাজ। সকল জাতি

সকল ধর্ম এবং সকল মানুষ লইয়া এই সমাজ গঠিত হইবে।

- ৩। জগতের মধ্যে যত প্রকার কার্য আছে তন্মধ্যে সর্ব সমাজ গঠন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য।
- ৪। সিদ্ধ যোগ লাভ হইলে পর প্রকৃত বিবাহ নিয়া কার্য হাসিল হইতে পারে। শেষ যোগেতে সিদ্ধ যোগের স্ত্রী পুরুষ সকলে জীবন মন ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জগত মুক্তির জন্য সাধন করিবে। অতএব মিশন হইতেই প্রকৃত বিবাহ উপস্থিত হইবে।
- ৫। প্রকৃত বিবাহ নিয়া সমাজ গঠিত হইলেই ধর্ম জীবনের প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হইবে। মানবগণ সফল মনোরথ হওয়ার জন্য সকলেই এই বিবাহ যোগ লাভ করিবে। যে সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ আদর্শ স্ত্রী বা পতি পাইবার জন্য সাধন করিবে সেই সমাজের নামই সর্ব সমাজ হইবে। দয়াময় নামে জগত দীক্ষিত হইবে। এক নাম একভাবে সকল হৃদয়কে অধিকার করিবে। সর্ব সমাজ লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে হইবে।
- ৬। পৃথিবীতে এখন সমাজের কঠোর নিয়মাদির শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার কার্য আসিল। মহিলারাও আর কোন প্রকারে বন্ধন মানিয়া থাকিতে পারিবে না। স্বাধীন ভাবে স্ত্রী পুরুষ কার্য করিতে প্রস্তুত হইল। জাতিগত কিংবা দেশগত অথবা ধর্মগত বৈষম্য কেহই মানিতে চাহিল

না। সকলের অন্তরই পবিত্র প্রেমের বন্ধন সিদ্ধ যোগে আসিল।

- ৭। প্রকৃত বিবাহ যোগ শরীরেতে কার্য না করিলে সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে পারিবে না।
- ৮। পৃথিবীতে আজ বীরাচার শেষ যোগেতে আসিল। যে সাধন দ্বারা স্ত্রী পুরুষ প্রকৃত বিবাহ নিয়া কার্য করিতে পারে তাহাই বীরাচার।

প্রচার কার্য

- ১। প্রকৃত তত্ত্ব, সর্ব ধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী ও যোগ প্রণালী এই সকল সর্ব ধর্মের মহা গ্রন্থের সত্য সকল যাতে নির্দোষ ভাবে প্রচার হয় তাহারই নাম প্রচার বিভাগ। প্রচারক ও আচার্য্যগণ এই সকল জটিল তত্ত্ব মীমাংসা করিবেন।
- ২। প্রচারক ও আচার্য্যরাই সভ্যদিগের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিবে। তাঁহারাই জাতিগত পার্থক্য নির্মূল করিবে এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। প্রচার বিভাগের মধ্যেই আয়ের সাধন রহিয়াছে।
- ৩। একজন বিশেষ ব্যক্তি আসিবেন এরূপ কথা আছে। তাঁহাকে নিয়াই পৃথিবীর মধ্যে দয়াময় নামের প্রচার কার্য সর্বতোভাবে উপায় হইবে। এই ব্যক্তির কার্য নিয়া প্রচারক ও আচার্য্যের উপায় হইবে।

- ৪। সর্ব ধর্মের সার প্রকৃত তত্ত্ব-ই বস্তুতঃ জগতের তত্ত্ব মীমাংসার বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মানবের সকলের মনে সংশয় ছিন্ন করিবে। ধর্মের সকল বিষয় সংশোধন করিবে।
- ৫। মিশনের সঙ্গে সর্বাত্মে মিশনের প্রচারক ও আচার্য্যেরাই মিশনের কার্য্য করিয়া আদর্শ দেখাইবে।
- ৬। প্রচার বিভাগ মিশনের বিভাগ জানিবে। ইহার কার্য্য যতই বাড়িবে ততই মিশনে প্রভূত উন্নতি হইবে।
- ৭। পুস্তক লিখিয়া প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবে।
- ৮। প্রচারের জন্য মিশন হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।
- ৯। জগতের মধ্যে এই অভিনব ধর্ম লইয়া প্রচারক ও আচার্য্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই আচার্য্যের সংখ্যা কম প্রক্ষে দুই হাজার হওয়া আবশ্যিক। যে পর্য্যন্ত প্রচারক ও আচার্য্যের সংখ্যা না বাড়িবে সে পর্য্যন্ত প্রচারের কার্য্য বেশী হইতে পারে না।
- ১০। সর্ব ধর্ম যাতে নির্দোষ ভাবে প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্যই প্রচার বিভাগ। তত্ত্ব মীমাংসার জন্যই এই বিভাগ কার্য্য করিবে।
- ১১। প্রচারক ও আচার্য্য পুস্তক লিখিবে ও পুস্তক ছাপাইবে।

সর্ব ধর্মোৎসব

- ১। মিশনের বার্ষিক উৎসবকে সর্ব ধর্মোৎসব বলে। এই উৎসবের কার্য্য দ্বারাই পৃথিবীতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।
- ২। ঈশ্বর প্রীতির জন্য জগতের মঙ্গলার্থে ও সর্ব নাম প্রচারের জন্যই উৎসব বিহিত হইয়াছে।
- ৩। উৎসবে আসিলে সকলেই এই মিশন উৎসবের কার্য্য নিজের কার্য্য মনে করিবে নতুবা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।
- ৪। এক বেলা খাওয়া মিশন হইতে পাইবে। ইহাই দুপুরের খাওয়া।
- ৫। চা, পান, তামাক, মুড়ি, চিড়াগং প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র, খাদ্য সামগ্রী প্রত্যেকে উৎসবে আসিলে কিনিয়া খাইবে ইহা স্থায়ী নিয়ম।
- ৬। সভা সমিতির কার্য্য নিজেদের সুবিধা মত করিবে। ইহার আর বিধি নিষেধ নাই-ইহা স্থায়ী নিয়ম।
- ৭। উৎসবের কার্য্য গঠিত কমিটির হিসাবেই চলিবে-ইহাও স্থায়ী নিয়ম।
- ৮। মিশন উৎসবে যোগ না দিয়া ইহার কার্য্য না করিয়া কেহই সাধন পাইবে না। কারণ এই উৎসব সর্ব ধর্ম্মানুসারে আবির্ভূত হয় এবং তদনুসারে ইহার

পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং এই উৎসবের নাম সর্ব
ধর্মোৎসব।

- ৯। জগতের কার্য সর্ব ধর্ম মিশনের কার্য উৎসবের মধ্যে
জগতের সাধন উপস্থিত হয়।

পেন্সন বিভাগ

- ১। ক) মিশনে ২৫ বৎসর চাকরী হইলে বেতনের অর্ধেক পেন্সন
পাইবে।

খ) ২০ বৎসর চাকরী হইলে বেতনের $\frac{১}{৬}$ অংশ পেন্সন
পাইবে।

গ) অন্য অবস্থায় চাকরী ছাড়িয়া গেলে রিলিফ ফণ্ড হইতে কিছু
সাহায্য পাইতে পারে।

বিবিধ

- ১। জগতে এখন কেহই সাধন না করিয়া চলিতে পারিবে না।
২। মিশনের কর্মচারীরা মিশনের জন্য দান করিয়া আদর্শ
দেখাইবে।
৩। দয়াময় নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে উদ্ধার হইয়াছে সর্ব ব্যাপারে।
৪। আজ ত্রিভুবন সর্বদার জন্য দয়াময়ের নামের মধ্যে ভুক্ত
হইল।
৫। পৃথিবীর দুর্দিন বিদূরিত হইয়াছে। সুদিনের আবির্ভাব দেখা
যাইতেছে।
৬। কৃপাধারা অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

- ৭। জগতের মধ্যে সর্বত্র একাচার স্থায়ী ভাবে প্রকাশিত হইল।
হিন্দুর কার্য, মুসলমানের কার্য, ইহুদীর কার্য এই ভাবে
সকলের কার্যই সকলের জীবনে স্থান লাভ করিল। ইহাই
একাচার।

- ৮। দয়াময়ের অধীন হইলেই পূর্ণ স্বাধীনতা আসিল।

- ৯। মিশনের সহিত জগত এবং জগতের সহিত ঈশ্বর
সর্বতোভাবে একসূত্রে গ্রথিত। ইহার অন্যথা হইতে
পারে না।

- ১০। সকল প্রকারের শাসন তন্ত্রের চরমোৎকর্ষ আরও অনেক
পরে হইবে। যখন ইহ পরলোকে এক রকম শাসনতন্ত্র
প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই সার্বভৌম রাজ্য গঠিত হইবে।
প্রকৃত শাসন প্রণালী সকলেই প্রাপ্ত হইবে।

- ১১। জগত বাসীর অর্থ পিপাসা বেশী কেহই নিজের স্বার্থ
ভুলিয়া ধন দৌলত উৎসর্গ করে না। এই জন্য পৃথিবী
এই রূপ অশান্তির আলায়ে পরিণত হইয়াছে।

- ১২। কেহই আর জন সাধারণের কার্যে জীবনোৎসর্গ না
করিয়া থাকিতে পারিবে না।

- ১৩। এখন সর্ব প্রতিকার দয়াময় নামে স্থিরীকৃত হইয়াছে
বলিয়া আর মৃত্যুর অধিকার থাকিবে না। সাধনের ফলে

দয়াময় নামের মধ্যে অমরত্বের সিদ্ধ যোগ সাব্যস্ত হইয়াছে।

- ১৪। মানব দেবতা সকল জাতি সকল সম্প্রদায় প্রভৃতি মিলিয়া কার্য্য করিতে লাগিল।
- ১৫। জগতে যত কর্ম্ম আছে সাধনার পথ আছে তৎ সমস্তই দয়াময় নামের মধ্যে নিবেসিত হইয়াছে। দয়াময় নামের কার্য্য করিয়াই জগতের অধিবাসী সকলেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভ করিবে।
- ১৬। জগত প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে। এক দিনের পর আর এক দিন উত্তম। পৃথিবীতে সাধনার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে। এজন্যই সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
- ১৭। শরীরে যাহার শক্তি আত্মাতে তাহারই শক্তি। মূল এক বলিয়া দেহেতেই জীবন মুক্তি লাভ হইবে।
- ১৮। জীবন মুক্তির কার্য্য নিয়া পৃথিবীতে একজন মহাপুরুষ উপস্থিত হইলে সকলে অশান্তি ভোগ করিবেনা।
- ১৯। স্ত্রী সাধন ও পতি সাধন পূর্ণ হইলে মৃত্যু দূর হয়।
- ২০। যে যেভাবে ভগবানের সহিত কার্য্য করিয়া সংলগ্ন হইবে সে তাহাই করিতেছে।

- ২১। তিন শত বৎসর গেলে পরলোক হইতে কেহ কেহ আসিবে। এক শত বৎসর না গেলে শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজ আসিবেন না।

-১৮ফাল্গুন ১৩৩৮ বাং

- ২২। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ-অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ-তিনি নিয়ত এক অর্থাৎ নিত্য।
- ২৩। মনের যোগ অর্থাৎ আমিত্ব শেষ হইলেই ঈশ্বর দেখা দেন।
- ২৪। সর্ব্ব ধর্ম্মের কার্য্যের প্রসার হেতু ধর্ম্মে ধর্ম্মে একতার ভাব প্রবল হইবে।
- ২৫। দয়াময় উপদেশ দিতেছেন তোমরা সকলে গৃহে বসিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও, শান্তি হইবে। গৃহেই সকল শান্তির আদর্শ রহিয়াছে।
- ২৬। গুরু না ধরিয়া ধর্ম্ম লাভের কার্য্যে ব্রতী হইবে না। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম উপস্থিত না হইলে জীবনে সাধনের কার্য্য সহজ অবস্থা আসিতে পারে না।
- ২৭। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সাধন করিতে পারে, অন্যের উপদেশ না লইয়া কার্য্য করিতে পারে, এমন কি জীবনের সার সম্পদ ঈশ্বর সেবা বুঝিতে পারে তজ্জন্য যথা সর্ব্বস্ব ঈশ্বরার্থে উৎসর্গ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই বিশ্বাসী।

- ২৮। এ ধর্মে জগত দীক্ষিত হইলে আচার লইয়া বিরোধ থাকিবে না।
- ২৯। মানুষ কি করিতেছে? যে যেভাবে ভগবানের সহিত কার্য করিয়া সংলগ্ন হইবে সে তাহাই করিতেছে।
- ৩০। পূর্ণ কার্য আরম্ভ হইলে জগতের লোক মিশনে যোগদান করিবে দেহ ধারী মানব পরলোক হইতে প্রকাশিত হইবে।
- ৩১। আমরা দয়াময়কে ডাকি এ কথা অগ্রাহ্য। দয়াময় যখন আমাদের ডাকিতে অবকাশ দেন তখনই কেবল আমরা ডাকিতে পারি।
- ৩২। ইহ পরলোকে একমাত্র মিশনের শক্তিতেই সকল কার্য উদ্ধার হইবে।
- ৩৩। সমগ্র জগত মিশন যোগেতে কার্য করিবে।
- ৩৪। দয়াময়ের কার্যই মিশনের কার্য।
- ৩৫। ধ্যানই মোক্ষপথ। চিন্তাতে মিশিলে ভাব খুলে সে নিজ স্বভাব। নাম ও নামী এক। নাম চিন্তাতেই স্বরূপ প্রকাশিত হইবে।
- ৩৬। জয় দয়াময়ের কার্য শেষ হইয়া গেল। এজন্য অদ্যাবধি কেবল দয়াময় নামের কার্য সর্বতোভাবে আদর্শ হইয়া কার্য দিবার সিদ্ধি আনয়ন করিল। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

- এখন আর নামেতে কোন রকমে অন্তরের বিকল অবস্থা আনিতে পারিবে না।
- ৩৭। জেনারেল বডির প্রত্যেক সভ্য মিশনের স্তম্ভ বিশেষ।
- ৩৮। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই যার যার ধর্মের পথ দিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের পথে আসিবে ও সময়ে সকলেই প্রেম যোগে মিলিত হইয়া পরিদ্রাণ লাভ করিবে।
- ৩৯। মহাকালী সর্ব জগতের কার্য নিয়া শ্রী আনন্দকে আদর্শ পতি জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহারই শ্রীপাদপদ্মে দেহ মন অর্পণ করিয়াছেন। এজন্য ইহাকে জগতের আদর্শ জানিবে।
- ৪০। জগতের মধ্যে মিশনের যত প্রকার কার্য আছে তন্মধ্যে সর্ব সমাজ গঠন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য। নাম লইয়া শান্তভাবে ঈশ্বর সাধনে রত হইয়া পড়িয়া থাকিলে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধ স্ত্রী বা পতির কথা স্বয়ং দয়াময় জানায়ে দিবেন। মিশন হইতেই প্রকৃত বিবাহ উপস্থিত হইবে। জগতের সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষ সর্ব সমাজের লোক বলিয়া গণ্য হইবে।

উনিশ অধ্যায় শান্তির সাধনা

শ্রীশ্রী কর্তা মহারাজ বিভিন্ন উপাসনায় সর্ব ধর্ম মিশনের কার্য জগত লইয়া সিদ্ধ যোগে স্থাপিত হওয়ার পর যে সকল সাধনার কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল-

রবি বাসরীয় বৈঠক ও শনি বাসরীয় বৈঠক

কৃষ্ণনগর মিশন বাড়ী ১৩৪০ বাংলা ৮ই ভাদ্র রাত্রিতে উপাসনা

এখন মিশনের কার্য বিশেষ রূপে চলিতে পারে তাহার রাস্তা হইল। সুতরাং আজ থেকে প্রতি রবিবার দিবসে কার্য প্রকাশ পাইবে ও শনিবার উহার পর্য্যবসান হইয়া যাইবে। এ জন্য রবিবার বিশেষ ভাবে সাধনের নিমিত্তে পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকের মধ্যেই দেখিবে রবিবার দিবসের কার্য বিশেষ ভাবে আসিয়া থাকে। অতএব রবিবার নিয়া কার্য পরিষ্কার হইলে জগতের মধ্যে সাধনের মূলে কোন অপূর্ণতা থাকে না। এই রবিবারেই শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের জন্ম। অতএব এই দিবসকে স্মৃতিতে রাখিয়া চলিতে পারিলে কাহারো কোন প্রকার ক্লেশ হইতে পারে এইরূপ কারণ নাই। জগতের মধ্যে এই জন্যে রবিবার নিয়াই সাধন আসিয়া থাকে।

আরও একটি কথা আসিল ইহা এই যে, জগতের মধ্যে একজন বিশেষ লোক আসিবেন এবং তিনিই সর্ব ধর্মের ঐক্যের নিমিত্তে কার্য করিবেন এরূপ উক্তি “প্রকৃত তত্ত্বে” লিখিত আছে। আজ এ সম্পর্কে কার্য আসিল। জীবনের আশা পূর্ণ হইবে, এই কথা মনের উৎসাহ আনিয়া থাকে এবং সকলেই জানিবার জন্য ব্যাকুল যে কবে আশার পূরণ হইতে পারে। সর্বাত্মে এ ধর্মের প্রচার করিয়া নামেতে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগেতে “ধর্ম চক্র” গড়িতে পারেন এরূপ একজন আচার্যের আবশ্যিক, কারণ একজন প্রচারক ও আচার্য সকলের সহিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং সর্ব ধর্মের একতা সিদ্ধ যোগে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন এরূপ লোক না হইলে মণ্ডলীর পরিচালনা কে করিবে? অতএব এই বিশেষ ব্যক্তিকে লইয়া আজ কার্য উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময় নামেতে “আচার্য দেব” এই লোকটিকে ‘নেতা’ বলিয়া কার্য দিলেন ইহার কার্যই আজ সাধনেতে আসিল। মিশনের কার্য এই জন্যে প্রতি শনিবার সর্ব ধর্ম অনুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সর্বতোভাবে কর্মচারীদিগকে নিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং যেমন দয়াময় নামেতে রবিবার সাব্যস্ত হইলে অশেষ উপকার হয় তেমন শনিবার নিয়া কার্য লাভ করিতে পারিলেও সাধনের বিশুদ্ধ অধিকার আসিয়া থাকে। শনিবার সম্বন্ধে একটি কথা এই যে মিশনের কার্যকারীরা এই দিনে অবসর ভোগ করিবে। মিশনের অফিস কিংবা দৈনিক নিয়মিত কার্য বন্ধ থাকিবে। ৩৬ হাজার

আদর্শ নিয়া অদ্যাবধি শনিবার সিদ্ধ যোগে কার্য্য পাইল। অতএব যারা মিশনের মেম্বার এবং কর্মচারী এমন কি যারা মিশনের মঙ্গলকামী লোক তারাও শনিবার দিবসের কার্য্য নিয়া শান্ত ভাবে অবস্থান করিবে। এই জন্য যারা নামের লোক তারা প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার সময় সংকীর্তন অন্ততঃ একটি হইলেও করিবে। এই উপদেশ “সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী” নামক মহাগ্রন্থে আছে। সুতরাং শনিবার যাতে সাধন ভজন দ্বারা অতিবাহিত করিতে পারা যায় তাহাই মন্ডলীর মধ্যে ভক্তগণের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

সাধন প্রণালী

যাহা কিছু সুখ এবং শান্তি পৃথিবীতে আছে ইহার মূলে স্বামী স্ত্রীর বিশুদ্ধ ভাব বিরাজ করিতেছে।

মানুষের দেহে অসংখ্য নাড়ী আছে তন্মধ্যে শক্তি চক্রে চক্রে কার্য্য করেন ইহা সাধকেরা দেখিতে পান। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী প্রধান। গুহ্য মূল হইতে ব্রহ্মরক্ত পর্য্যন্ত সুষুম্নার প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই ত্রিবিধ শক্তি পথ সাধনের একমাত্র অবলম্বন ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। যোগ শাস্ত্রে এই নাড়ী চক্রকে ষট চক্র বলে। আমাদের বাহিরের ভাবে ডাক্তারের ইহার গঠন প্রণালীতে বিশেষত্ব দেখিবেন। এই ঈড়া নাড়ী স্ত্রী শক্তির বোধক, পিঙ্গলা পুং শক্তির বোধক বলিতে পারা যায়। উভয়ের মিলিত ভাব যেখানে সেখানে

হইতেই সাধক সুষুম্নার উন্মেষ দেখিবেন। এই তিনটি নাড়ীকে কেহ এসে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী বলিয়াছেন। কেহবা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্য মনে হয় বাস্তবিক মানব দেহ স্ত্রী পুরুষ তত্ত্বে গঠিত। ইহাদের মিলনেই শান্তি ও শক্তির অভিব্যক্তি হইতে পারে। ঈড়ার পর্য্যবেক্ষণে অনুরূপা স্ত্রী এবং পিঙ্গলার পর্য্যবেক্ষণে অনুরূপ স্বামী মিলিবেই মিলিবে। নচেৎ জগতের যোগে সাধন প্রতিষ্ঠিত হইবেনা। সর্ব্ব শরীরে যেমন ঈড়াকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে তেমন পিঙ্গলা ধরিয়া পুরুষ প্রকৃতি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাক্ষাৎ ভাবে সুষুম্নার গতি সন্দর্শন করিলে উভয়ের মিলনে যে ত্রিজগত চলিতেছে উপলব্ধি হইবে। এই সুষুম্নার অভ্যন্তরে উহার সর্ব্ব ভাবেই মা মহাশক্তির রাজ্য ষোলকলায় পূর্ণ রহিয়াছে।

জয়াপতি এক মুরতি-

অনন্ত সমুদ্র হইতে দুইটি শ্রোত ধারা স্ত্রী পুরুষ রূপে পাশাপাশি অন্তরের দিকে ছুটিয়াছে। যেখানে দুই শ্রোত এক হইয়া পড়িবে ও অস্তিত্ব হারাইবে সেখানেই মুক্তি পথ ছুটিয়া বাহির হইবে।

অতএব যদি সাধন করিতে চাও স্ত্রী সহযোগে কার্য্য কর। মানস অচিরে সফল হইবে। ইহাই সাধন পথ-ইহাই উন্নতির হেতু।

প্রেম সাধন

শরীর এবং আত্মা এক। এই কথা সত্য। আজ উভয়ের পার্থক্য শেষ হইয়া যাইতে পারে তাঁহার কার্য উপস্থিত হইয়া গেল। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতি ঈশ্বরের শক্তি সম্ভূত বিভূতি। উভয়ের পার্থক্য বস্তুতঃ কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না। কারণ এই যে স্বয়ং পরমেশ্বর এই দুই প্রকার মূর্তি গ্রহণ করিয়াই জগতে প্রসঙ্গ নিয়া কার্য করিতেছেন। সুতরাং দুই জাতির মধ্যে চির সম্ভূত একতার যোগ ব্যতীত সাধন পূর্ণ হইতে পারে না। কাম ও প্রেম এক যোগে অবস্থিতি করিলেও পার্থক্য এই যে কাম সাধনের মধ্যে অভিলাষানুরূপ দেহের সঙ্কোচ এবং প্রেম শরীর ও আত্মার উভয়ের অনাদি কারণ সম্ভূত মিলন। উভয়ের মধ্যে এখন আর পৃথক ব্যাপার কিছুই নাই। কামেতে স্ত্রী পুরুষ প্রবৃত্তির বশে কার্য করিয়া থাকে এবং সাধনার কার্য পথে শরীর নিয়া একের সহিত অন্যের মিলন হইতে পারে তার জন্য বিব্রত থাকে। সত্যই দুই শরীর এক হইবার নিমিত্তেই মৈথুন। এই কার্য হইতেই আধ্যাত্মিক মিলনেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তবে সাধনের মধ্যে যদি কেহ এই মৈথুন ব্যাপার ধরিয়া শেষ ফল পাইতে চাহে ইহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কার্য।

বাস্তব কথা এই শরীর এবং আত্মা উভয়ের ঐক্য যোগ বিনা কেহই শেষ ফল পাইতে পারে না। মনে রাখা উচিত যে শরীর

এবং আত্মা উভয়ের সর্বতোভাবে মিলিবার উপায় হইলেই প্রকৃত প্রেম লাভ হইতে পারে। প্রেমেতে স্বামী স্ত্রী কোন প্রকারের আকাঙ্ক্ষা বিনাই জীবন মরণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে আপন করিয়া লয়। সুতরাং কামের কার্য আজ মিশনের যোগে শেষ হইল। বিশেষ কথা এই প্রেমের কার্য আজ সাধনে উপস্থিত হইল এবং প্রেমেতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের কার্য শেষ যোগে সিদ্ধ হইল।

আয়ু বৃদ্ধি

- ১। মিশনের প্রত্যেক বিশেষ কার্যের মধ্যে মিশনের সেবকদের প্রানের আবেগের সহিত আয়ুরও বিশেষ বৃদ্ধি হইবে। জন্মের দোষের বা অন্য কোন প্রকারের হেতুতে যাহাদের আয়ুর পরিমাণ হ্রাস পাইবে দেখিতে পাইবে তাহাদের মধ্যেও আমাদের মিশনের উপায় নিশ্চয়ার্থে সিদ্ধি যোগেতে বিশুদ্ধ আয়ুর বৃদ্ধি পাইবে। কেননা মিশনের প্রয়োজনেই এমন ভাবের যোগ আছে।
- ২। সত্য ভিন্ন মিথ্য আচরণ করিবে না পৃথিবীতে এই একটি কথাতে আমাদের প্রাণের মধ্যে উপাসনার যোগেতে পরমায়ুর পরিমাণ বাড়িবেই বাড়িবে।
- ৩। যিনি দিবা রাত্রি উপাসনার কার্যে যোগ দিবেন তাহাকে অম্লানু হইতে হইবে না। আমাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনেই আজ থেকে মিশনের মধ্যে যিনি কার্য করিবেন

তিনি দীর্ঘ জীবন পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই জানিবে।
জীবনের মধ্যে এজন্য একবার অন্ততঃ দিবা রাত্রির মধ্যে
সম্প্রীক সাধনের নিয়ম পালিবে। মনের প্রতিষ্ঠাই জীবনের
প্রতিষ্ঠা। জয়দুর্গা দেবীতেই মিশনের নিভরসা সিদ্ধির
কার্যেতে সিদ্ধ যোগ হইয়াছে।

আনন্দ পাছান

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮বাংলা উপাসনা।

জাতীয় ধর্মের হিসাবে যেমন মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিতে চিহ্ন
ব্যবহৃত হইয়া থাকে যেমন আসনাদি ও নামেতে নিদিষ্ট হইয়া
থাকে সেইরূপ মিশনের হিসাবেও ব্যবহার করিবার নিমিত্তে
মেম্বারদের এক রকম বস্ত্রের পাগড়ির ব্যবস্থা হইবে- ইহাকে
আমরা মহাপুরুষদের উপাসনার আদর্শের বিজয় কেতন বলিব।
অর্থাৎ এই পতাকা চিহ্ন দ্বারা মানুষের মনে ঈশ্বরের উপাসনার
কার্য আসিবেই আসিবে। এই চিহ্ন এক দিন ব্যবহার করিতেই
হইবে। সে দিন একবার হইলেও ইহা মস্তকাভরণ করিবে।
উহাতেই মিশনের আয় এবং ব্যয় উভয় লইয়াই আমাদের
প্রত্যেকের শান্তি আসিবে। জগতের মধ্যে এই বিশেষ দিনকে
মিশনের উৎসব দিন মনে করিবে অর্থাৎ যেদিনে মিশনের উৎপত্তি
হইয়াছিল সে দিনের মধ্যে যে সময় উপাসনার প্রয়োজন হইবে
সে সময় উহার ব্যবহার করিবে।

‘জয় দুর্গা তুমি দয়াময়’ দশবার বল

সুতরাং শেষ যোগে মিশনের মেম্বার দিগকে শিরোভূষণ বাণিজ্যের
ব্যাপারেও ব্যবহার করিতে হইবে-যে যে অর্থের সম্বন্ধ থাকিবে
উহাতেই শিরোভূষণ পড়িবে। সর্বদার জন্য ইহার ব্যবহার
করিলেও দোষ নাই দেখিবে বরং ইহাতেই মিশনের প্রেমে হৃদয়
প্রাণ দেহ পরিপূর্ণ হইবে। সিদ্ধ যোগে এই ভূষণের নাম আনন্দ
পাছান বলিবে। কারণ এই যে ইহাই সিদ্ধ বিধানের মণি মঞ্জলা
দেবীর আদর্শ বিবাহের চিহ্ন। এই কারণেই জানিবে এই চিহ্ন
জীবনের আদর্শের পবিত্র নিদর্শন। ইহাতে সিদ্ধ বিবাহের কার্যও
রহিয়াছে।

অদ্যাবধি এই চিহ্ন শিরঃ শোভিত হইবে। অতএব রক্ত বস্ত্রের ১০
হাত পরিমাণে এবং ২১ হাত পরিমাণে শিরস্ত্রাণ করিবে। ইহাই
আদর্শ বিধান। এই বস্ত্রের পরিমাণ অন্য কোন রকম হইবে না।
প্রথমে দশটি দিকের সংখ্যা নিয়াই দশ হাত বলা হইয়াছে। হস্তের
পরিমাণ ঈশ্বরের মিশনাধিকারীদিগের অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখিবে আর
সাদৃশ্য-দ্বিহস্তের পরিমাণেতে কেবল সর্ব সেবকদের গাত্রাভরণের
মধ্যে কতক পরিমাণে হৃদয়ের সোজা ভাব বুঝা যাইতেছে।

...সমাপ্তি...